পোশাক শিল্পে কর্মরত সেবাপ্রদানকারীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য, অধিকার এবং পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণ সহায়িকা

আপনার স্বাস্থ্য আমাদের অঙ্গীকার
HPNSDP
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

Nuffic
meet the world

পোশাক শিল্পে কর্মরত সেবাপ্রদানকারীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য, অধিকার এবং পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণ সহায়িকা

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

Nuffic
meet the world

পোশাক শিল্পে কর্মরত সেবাপ্রদানকারীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য, অধিকার এবং পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণ সহায়িকা

(অংশগ্রহণকারীদের জন্য)

STITCH

SRHR Tailor-made Information and Training to Contribute to Occupational Health and safety conditions of factory workers in the Ready-Made Garment Sector in Bangladesh

পরামর্শক সহযোগিতা:

USAID FROM THE AMERICAN PEOPLE

সুখী জীবন
সবার জন্য পরিবার পরিকল্পনা

PATHFINDER

পোশাক শিল্পে কর্মরত সেবাপ্রদানকারীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য, অধিকার এবং পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণ সহায়িকা

(অংশগ্রহণকারীদের জন্য)

উপদেষ্টা সম্পাদক:

মো. নিয়াজুর রহমান
পরিচালক (অর্থ) ও লাইন ডাইরেক্টর
(এফপি-এফএসডি), পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

সম্পাদনা পরিষদ:

হাসান আমীন সুমন
প্রোগ্রাম ম্যানেজার, এফপি-এফএসডি,
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

ডা. পীযূষ চন্দ্র সূত্রধর
প্রোগ্রাম ম্যানেজার, এফপি-এফএসডি,
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

মোহাম্মদ রোকন উদ্দীন
সহকারী পরিচালক (ভিডিও) ও ডেপুটি প্রোগ্রাম
ম্যানেজার, এফপি-এফএসডি, পরিবার পরিকল্পনা
অধিদপ্তর এবং ফোকাল পার্সন, স্টিচ প্রকল্প

মোহাম্মদ জয়নুল আবেদীন
ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, এফপি-এফএসডি,
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

ইন্দ্রানী দেবনাথ
ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, এফপি-এফএসডি,
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

খালেদা ইয়াসমিন
ন্যাশনাল কোঅর্ডিনেটর, এফপি-এফএসডি,
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

সংকলন ও কারিগরি সহযোগিতা:

মো. ওমর ফারুক
কনসালটেন্ট, পাথফাইন্ডার ইন্টারন্যাশনাল

রেহান উদ্দিন আহমেদ রাজু
কনসালটেন্ট, পাথফাইন্ডার ইন্টারন্যাশনাল

ডা: শিরিন আখতার
কনসালটেন্ট, পাথফাইন্ডার ইন্টারন্যাশনাল

বিশেষজ্ঞ দল, ভিইউ

বিশেষজ্ঞ দল, রেডঅরেঞ্জ কমিউনিকেশন্স

বিশেষজ্ঞ দল, ইন্ডিজিনায়াস পিপল ডেভেলপমেন্ট
সার্ভিসেস (আইপিডিএস)

আরেফা হোসেইন অন্তরা
ম্যানেজার, আরবান ফ্যামিলি প্ল্যানিং সার্ভিসেস,
সুখী জীবন, পাথফাইন্ডার ইন্টারন্যাশনাল

বিশেষ কৃতজ্ঞতা:

ডা. মো. সারোয়ার বারী
অতিরিক্ত সচিব
মহাপরিচালক, পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও
পরিদর্শন অনুবিভাগ

স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পলী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়;
সাবেক পরিচালক (অর্থ) ও লাইন ডাইরেক্টর
(এফপি-এফএসডি), পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

মো. আমিনুল ইসলাম
সাবেক পরিচালক (অর্থ) ও লাইন ডাইরেক্টর
(এফপি-এফএসডি), পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

প্রকাশক:

ফ্যামিলি প্ল্যানিং-ফিল্ড সার্ভিসেস ডেলিভারি
(এফপি-এফএসডি), পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ: রেডঅরেঞ্জ কমিউনিকেশন্স

প্রকাশকাল: ফেব্রুয়ারি, ২০২৩

Cover Photo @DavidJonesStore via Twitter

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ সরকার পরিবার পরিকল্পনা সেবার পাশাপাশি প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে আসছে। প্রজনন স্বাস্থ্য হচ্ছে জীবনের প্রতিটি ধাপে প্রজনন সম্পর্কিত একটি পরিপূর্ণ দৈহিক, মানসিক এবং সামাজিক কল্যাণের সামগ্রিক অবস্থা অর্থাৎ একজন মানুষ নিরাপদ যৌন জীবনযাপন করতে পারবে, প্রজননে সক্ষম হবে এবং এই ব্যাপারে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে। এ সম্পর্কিত জ্ঞান ও তথ্য জেন্ডার বৈষম্য হ্রাসে সাহায্য করবে। তাই অত্যাবশ্যকীয় সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে পোশাক শিল্প কারখানায় স্বাস্থ্যসেবার সাথে যারা জড়িত আছেন তাদের এ সম্পর্কিত বিষয়ের উপর আরো জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

পরিবার পরিকল্পনা এবং প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমকে পোশাক শিল্প কারখানায় কর্মরত সেবাপ্রদানকারীদের মাধ্যমে জোরদার করার লক্ষ্যে "প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ে জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন জোরদারকরণের" জন্য ডাচ্ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে এবং নেদারল্যান্ডসভিত্তিক সাহায্যকারী সংস্থা নাফিক-এর তত্বাবধানে প্রকল্প স্টিচ (STITCH)-এর অধীনে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর-এর উদ্যোগে "যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য, অধিকার (SRHR) এবং পরিবার পরিকল্পনা" শীর্ষক এই প্রশিক্ষণ কারিকুলাম প্রণয়ন করেছে।

বাংলাদেশে বর্তমানে ৪৬২১টি পোশাক শিল্পে (২০১৮-১৯) প্রায় ৩৬ লক্ষ পোশাক নির্মাণ কর্মী রয়েছে (৬৫% নারী কর্মী) যারা দেশে রপ্তানি আয়ে ৮০% এরও বেশি অবদান রাখছে। পোশাক নির্মাণ কর্মীদের বেশির ভাগ প্রত্যন্ত অঞ্চল ও গ্রাম থেকে আগত, স্বল্প শিক্ষিত অথবা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই। যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য, অধিকার এবং পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে তাদের পর্যাপ্ত ধারণা ও জ্ঞান না থাকায় প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা গ্রহণে তারা সচেতন নয়। এই বিশাল কর্মীবাহিনীকে কর্মক্ষম রেখে মানসম্মত উৎপাদন বাড়াতে তাদের শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ রাখতে হবে। এজন্য প্রতিটি কারখানায় স্বাস্থ্য সেবাকেন্দ্র ও সেবাপ্রদানকারী, ডাক্তার, নার্স ও প্যারামেডিক রয়েছেন।

কারিকুলামে পরিবার পরিকল্পনা সেবার পাশাপাশি "যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য, অধিকার এবং পরিবার পরিকল্পনা" বিষয়সমূহ বিশেষ করে SRHR সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা, নিরাপদ মাতৃত্ব ও জরুরি প্রসূতি সেবা, কিশোর-কিশোরীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা, কাউন্সেলিং, মাসিক নিয়মিতকরণ, প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ (RTI), যৌনবাহিত সংক্রমণ (STI), প্রজনন স্বাস্থ্যের গুণগত সেবা, মাসিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও পরিচ্ছন্নতা, যৌন ও জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা এবং নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ইত্যাদি বিষয়ে মৌলিক আলোচনা করা হয়েছে। যাতে পোশাক শিল্প কারখানায় কর্মরত সেবাপ্রদানকারীগণ সহজেই উল্লিখিত বিষয়ের ওপর সঠিক তথ্য ও ধারণা নিয়ে নিজেদের কর্মদক্ষতা বাড়াতে ও মানসম্মত সেবা প্রদান করতে পারেন।

এই মহতী উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত ফ্যামিলি প্ল্যানিং-ফিল্ড সার্ভিসেস ডেলিভারিসহ পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট সকলকে এবং নেদারল্যান্ডসভিত্তিক সাহায্যকারী সংস্থা, কারিকুলাম প্রণয়নকারী দল ও স্টিচ প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট সকলকে তাদের নিবেদিত কাজের জন্য আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার প্রত্যাশা "যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য, অধিকার এবং পরিবার পরিকল্পনা" শীর্ষক এই প্রশিক্ষণ সহায়িকার কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারলে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) এর অভীষ্ট-৩ অর্জন আরো সহজ হবে।

সাহান আরা বানু, এনডিসি
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

শুভেচ্ছা বাণী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির লক্ষ্যমাত্রা হলো, ২০২২ সালের মধ্যে সক্ষম বিবাহিত নারী প্রতি গড় সন্তান সংখ্যা ২.০ এ নামিয়ে আনা, যার মাধ্যমে প্রতিস্থাপনযোগ্য জনউর্বরতা অর্জন করা সম্ভব হবে। এজন্য পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার কমপক্ষে ৭৫%-এ উন্নীত করতে হবে। জুন ২০২২ সালের মধ্যে মাতৃ-মৃত্যুর হার প্রতিহাজার জীবিত জন্মে ১.৭৬ থেকে ১.২১ এ নামিয়ে আনা ও পরিবার পরিকল্পনার অপূরণীয় চাহিদা ১০% নামিয়ে আনা এবং পদ্ধতি ছেড়ে দেওয়ার হার ২০% কমিয়ে আনা প্রয়োজন। তাই আমরা যদি কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে চাই তাহলে সেবাপ্রদানকারীর দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি সেবার গুণগত মানের উন্নয়নের লক্ষ্যে আরো কাজ করতে হবে। এজন্য প্রয়োজন সমন্বিত উদ্যোগ।

যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার বাংলাদেশে মানব স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই ম্যানুয়াল প্রণয়নের লক্ষ্যে একটি ওয়ার্কিং কমিটি পরিবার পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও বিশেষজ্ঞবৃন্দের সুচিন্তিত মতামত, উপদেশ এবং কর্মনিষ্ঠায় সম্পন্ন করা হয়েছে। পরিবার পরিকল্পনা এবং প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম বিষয়ে পোশাক শিল্পে কর্মরত সেবাপ্রদানকারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য "যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য, অধিকার এবং পরিবার পরিকল্পনা" বিষয়ে এই প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রণয়ন করা হয়েছে। তাছাড়া বেসরকারি স্বাস্থ্যকর্মীগণ যারা প্রজনন ও যৌন স্বাস্থ্য এবং অধিকার বিষয়ক সেবার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন তারাও এটি ব্যবহার করতে পারবেন। এই ম্যানুয়াল পোশাক শিল্প কারখানার ক্লিনিক ও স্বাস্থ্য সেবাকেন্দ্রে কর্মরত সেবাপ্রদানকারীদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং প্রত্যাশিত আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে যথেষ্ট অবদান রাখবে বলে আমাদের প্রত্যাশা।

বাংলাদেশে বাঙালি জাতি ছাড়াও অন্যান্য অনেক নৃ-গোষ্ঠীর মানুষ স্মরণাতীত কাল থেকে বসবাস করছে। যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য, অধিকার এবং পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কেও তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ রয়েছে। সাংস্কৃতিক বৈচিত্রের এই বিষয়গুলো সেবাপ্রদানকারী এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে অত্যন্ত সংবেদনশীলতা ও সম্মানের সাথে উপলব্ধি করতে হবে। এছাড়াও বর্তমানে সরকার শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য, অধিকার এবং পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে সেবা পাওয়ার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় এনেছেন।

তাই বিষয়ভিত্তিক অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ দ্বারা গঠিত ম্যানুয়াল প্রণয়নকারী কমিটির মাধ্যমে ম্যানুয়াল প্রস্তুত করা হয়েছে। এজন্য ফ্যামিলি প্ল্যানিং-ফিল্ড সার্ভিসেস ডেলিভারিসহ পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা, নেদারল্যান্ডসভিত্তিক সাহায্যকারী সংস্থা ও স্টিচ প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা এবং যারা ম্যানুয়াল প্রণয়ন কমিটির সম্মানিত সদস্য হিসেবে কাজ করেছেন সকলকে আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তাদের অভিজ্ঞতালব্ধ মূল্যবান মতামত, পরামর্শ এবং আন্তরিক ও অক্লান্ত শ্রম মানসম্মত ম্যানুয়াল প্রণয়নে বিশেষ অবদান রেখেছে। তাদের স্বতঃস্ফূর্ত ও আন্তরিক প্রচেষ্টার ফসলই এই ম্যানুয়াল।

পরিশেষে, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রণীত "যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য, অধিকার এবং পরিবার পরিকল্পনা" বিষয়ক ম্যানুয়াল শুধুমাত্র যারা প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা-প্রদান করছেন তাদেরই উপকারে আসবে তা নয়, যারা প্রজনন স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ধারণা নিতে এবং গবেষণা করতে চান তাদেরও উপকারে আসবে। এই ম্যানুয়াল পোশাক শিল্প কারখানায় কর্মরত সেবাপ্রদানকারীদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে যথেষ্ট সহায়তা করবে- এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

মো. নিয়াজুর রহমান
পরিচালক (অর্থ) ও লাইন ডাইরেক্টর (এফপি-এফএসডি)
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার এবং পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ সহায়িকা-এর

ওয়ার্কিং কমিটি-এর সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক	নাম ও পদবী	কর্মক্ষেত্র
১.	**মো. নিয়াজুর রহমান** পরিচালক (অর্থ) ও লাইন ডাইরেক্টর (এফপি-এফএসডি), পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর	পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
২.	**ডা. মো. সারোয়ার বারী** **অতিরিক্ত সচিব** মহাপরিচালক, পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও পরিদর্শন অনুবিভাগ; সাবেক পরিচালক (অর্থ) ও লাইন ডাইরেক্টর (এফপি-এফএসডি), পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর	স্থানীয় সরকার, পলী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়;
৩.	**মো. আমিনুল ইসলাম** সাবেক পরিচালক (অর্থ) ও লাইন ডাইরেক্টর (এফপি-এফএসডি)	পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
৪.	**ডা. মো. শামসুল করিম** পরিচালক	মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, লাল কুঠি মাজার রোড, মিরপুর-১, ঢাকা পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
৫.	**হাসান আমীন সুমন** প্রোগ্রাম ম্যানেজার, এফপি-এফএসডি, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর	ফ্যামিলি প্ল্যানিং-ফিল্ড সার্ভিসেস ডেলিভারি, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
৬.	**ডা. পীযূষ চন্দ্র সূত্রধর** প্রোগ্রাম ম্যানেজার, এফপি-এফএসডি	ফ্যামিলি প্ল্যানিং-ফিল্ড সার্ভিসেস ডেলিভারি, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
৭.	**মো. ইফতেখার রহমান** উপপরিচালক, আইইএম ইউনিট, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর	আইইএম ইউনিট, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
৮.	**ডা. মো. জাহাঙ্গীর আলম প্রধান** উপপরিচালক, এমসিএইচ ইউনিট, সাবেক প্রোগ্রাম ম্যানেজার, এফপি-এফএসডি	এমসিএইচ সার্ভিসেস ইউনিট পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
৯.	**মো. মিজানুর রহমান** উপপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা, বরিশাল; সাবেক উপপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), পরিবার পরিকল্পনা, ঢাকা	পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

ক্রমিক	নাম ও পদবী	কর্মক্ষেত্র
১০.	**ডা. মো. মনজুর হোসেন** সহকারী পরিচালক	এমসিএইচ সার্ভিসেস ইউনিট পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
১১.	**খন্দকার মাহবুবুর রহমান** সহকারী পরিচালক (পরিবহন), প্রশাসন ইউনিট সাবেক সহকারী পরিচালক, আইইএম ইউনিট	প্রশাসন ইউনিট পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
১২.	**মোহাম্মদ রোকন উদ্দীন** সহকারী পরিচালক (ভিডিও) ও ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, এফপি-এফএসডি এবং ফোকাল পার্সন, স্টিচ প্রকল্প	ফ্যামিলি প্ল্যানিং-ফিল্ড সার্ভিসেস ডেলিভারি পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
১৩.	**মোহাম্মদ জয়নুল আবেদীন** ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, এফপি-এফএসডি	ফ্যামিলি প্ল্যানিং-ফিল্ড সার্ভিসেস ডেলিভারি, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
১৪.	**ইন্দ্রানী দেবনাথ** ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, এফপি-এফএসডি	ফ্যামিলি প্ল্যানিং-ফিল্ড সার্ভিসেস ডেলিভারি, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
১৫.	**খালেদা ইয়াসমিন** ন্যাশনাল কোঅর্ডিনেটর, এফপি-এফএসডি	ফ্যামিলি প্ল্যানিং-ফিল্ড সার্ভিসেস ডেলিভারি, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
১৬.	**ড. এলেন বল** প্রজেক্ট ডিরেক্টর - ডাচ পার্টনার, স্টিচ এবং অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর	ভিইউ
১৭.	**এস্থার দেনহার্টগ** প্রজেক্ট কোঅর্ডিনেটর - ডাচ পার্টনার, স্টিচ এবং প্রজেক্ট ম্যানেজার, সিআইএস	ভিইউ
১৮.	**ড. আদনান হোসাইন** এক্সপার্ট, ডাচ পার্টনার, স্টিচ	ভিইউ
১৯.	**ড. রুনা লায়লা** এক্সপার্ট, ডাচ পার্টনার, স্টিচ	ভিইউ
২০.	**অর্ণব চক্রবর্তী** এক্সপার্ট, কমিউনিকেশন্স ও এসআরএইচআর, স্টিচ এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর, রেডঅরেঞ্জ কমিউনিকেশন্স	রেডঅরেঞ্জ কমিউনিকেশন্স
২১.	**নাকিব রাজীব আহমেদ** এক্সপার্ট, রেডঅরেঞ্জ কমিউনিকেশন্স, স্টিচ	রেডঅরেঞ্জ কমিউনিকেশন্স

ক্রমিক	নাম ও পদবী	কর্মক্ষেত্র
২২.	**রুহান শামা** প্রজেক্ট কোঅর্ডিনেটর (বাংলাদেশ), স্টিচ এবং প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রেডঅরেঞ্জ কমিউনিকেশন্স	রেডঅরেঞ্জ কমিউনিকেশন্স
২৩.	**ঐন্দ্রিলা চক্রবর্তী** প্রজেক্ট কোঅর্ডিনেটর	রেডঅরেঞ্জ কমিউনিকেশন্স
২৪.	**মাধবী হালদার** গ্রাফিক্স ডিজাইনার	রেডঅরেঞ্জ কমিউনিকেশন্স
২৫.	**সঞ্জীব দ্রং** এক্সপার্ট, ডাচ পার্টনার, স্টিচ	ইন্ডিজিনায়াস পিপল ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসেস (আইপিডিএস)
২৬.	**তুলি লাবণ্য ম্রং** এক্সপার্ট, ডাচ পার্টনার, স্টিচ	ইন্ডিজিনায়াস পিপল ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসেস (আইপিডিএস)
২৭.	**মো. মাহবুব উল আলম** প্রজেক্ট ডিরেক্টর, সুখী জীবন এবং কান্ট্রি ডিরেক্টর পাথফাইন্ডার ইন্টারন্যাশনাল	পাথফাইন্ডার ইন্টারন্যাশনাল
২৮.	**আরেফা হোসেন অন্তরা** ম্যানেজার, আরবান ফ্যামিলি প্ল্যানিং সার্ভিসেস; সুখী জীবন	পাথফাইন্ডার ইন্টারন্যাশনাল
২৯.	**ডা. ইতুকি চাকমা** সিনিয়র টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজার	পাথফাইন্ডার ইন্টারন্যাশনাল
৩০.	**সোহরাব হোসেন** অ্যাডোলেসেন্ট বিহেভিয়ার চেঞ্জ ম্যানেজার	পাথফাইন্ডার ইন্টারন্যাশনাল
৩১.	**ইমরুল হাসান খান** কনসালটেন্ট এবং সিনিয়র এডভাইজার, হেল্‌থ এন্ড ফ্যামিলি প্ল্যানিং সিস্টেম স্ট্রেন্দেনিং	গতি কনসালটেনসি নেটওয়ার্ক
৩২.	**মাহমুদুর রহমান চৌধুরী** সিনিয়র পলিসি, এসআরএইচআর এন্ড ইভালুয়েশন এডভাইজার	এসএনভি নেদারল্যান্ডস ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন, বাংলাদেশ
৩৩.	**মাসুদুল হক** কনসালটেন্ট-প্রোগ্রাম	আরএইচ স্টেপ
৩৪.	**মো. শওকত হোসেন** ব্যবস্থাপক	মেরী স্টোপস বাংলাদেশ

পোশাক শিল্পে কর্মরত সেবাপ্রদানকারীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য, অধিকার এবং পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণ সহায়িকা

লক্ষ্য

- জনগণের দ্বারপ্রান্তে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অত্যাবশ্যকীয় সেবা প্যাকেজের উল্লেখযোগ্য উপাদান হিসেবে প্রজনন স্বাস্থ্যের প্রদেয় সেবাসমূহ নিশ্চিতকরণ;
- তথ্য, প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে প্রাপ্ত নিরাপদ ও গ্রহণযোগ্য পরিবার পরিকল্পনা, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা/ সুবিধাসমূহ পাওয়ার অধিকার নিশ্চিতকরণ;
- মাতৃ-অসুস্থতা এবং শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার কমিয়ে আনা;
- নবজাতক, শিশু ও কৈশোরকালীন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করে নবজাতক, শিশু ও কৈশোরকালীন মৃত্যু ও অসুস্থতার হার কমিয়ে আনা;
- পোশাক শিল্পে কর্মরত নৃ-গোষ্ঠীর মানুষদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা সম্পর্কে ধারণা প্রদান এবং প্রয়োজনে তাদের সেবা ও সুবিধাসমূহ পাওয়ার অধিকার নিশ্চিতকরণ;
- ব্যক্তি ও পরিবারের স্বাস্থ্য ও সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার বিষয়ে সেবাপ্রদানকারীদের জ্ঞানার্জন ও শেখার অধিকার নিশ্চিতকরণ।

সহায়িকা তৈরির উদ্দেশ্য

- যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার বিষয়ে সেবাপ্রদানকারীদের সম্যক ধারণা দেয়া;
- বিভিন্ন জনগোষ্ঠির তথা পরিবারের স্বাস্থ্য ও সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে পরিবার পরিকল্পনা, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার সম্পর্কে উদ্দিষ্ট সেবাপ্রদানকারীদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা;
- উন্নততর প্রযুক্তির ফলে প্রাপ্ত নিরাপদ, গ্রহণযোগ্য পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়াদির উপর মানসম্মত সেবা দক্ষতার সাথে প্রদান করা;
- সেবাপ্রদানকারীদের পোশাক শিল্প কারখানার জনগোষ্ঠীর সঙ্গে পরিবার পরিকল্পনা, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার বিষয়ে জ্ঞানার্জনের জন্য সহায়িকাটিকে যোগাযোগের একটি উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা;
- যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা কার্যকরভাবে সম্পাদন করার জন্য সেবাপ্রদানকারীদের সহায়ক হিসেবে দিক নির্দেশনা দেওয়া;
- এই সহায়িকাটির মাধ্যমে সেবাপ্রদানকারীরা পোশাক শিল্প কারখানার জনগোষ্ঠীর সঙ্গে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার বিষয়ে যোগাযোগ করা, উল্লিখিত বিষয়ে তাদের সচেতন করা, সেবা নেওয়ার আগ্রহ এবং গ্রহণের ব্যাপারে জনগোষ্ঠীর অভ্যাস গড়ে তুলতে সাহায্য করা;
- নৃ-গোষ্ঠীর মানুষ, কিশোর-কিশোরী এবং প্রজনন বয়সী নারীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার সম্পর্কিত সেবা গ্রহণের পরামর্শ দেয়া এবং জরুরি ক্ষেত্রে তাদের উচ্চতর পর্যায়ে সেবা প্রদান কেন্দ্রে প্রেরণ করতে উৎসাহিত করা।

প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য

এই প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্যঃ

পোশাক শিল্পে কর্মরত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য, অধিকার এবং পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

এই প্রশিক্ষণের নির্ধারিত উদ্দেশ্য অংশগ্রহণকারীদের-

- যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার বিষয়ে সেবাপ্রদানকারীদের ধারণা প্রদান তথা জ্ঞান ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা;
- নিরাপদ, গ্রহণযোগ্য পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়াদির মানসম্মত সেবা-প্রদান বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা;
- আচরণ পরিবর্তনে যোগাযোগ ও এসআরএইচআর বিষয়ে কাউন্সেলিং করার জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা;
- মাসিক (ঋতুচক্র) ও মাসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা;
- নিরাপদ মাতৃত্ব ও জরুরি প্রসূতি সেবা এবং নবজাতকের অত্যাবশ্যকীয় সেবা প্রদানের দক্ষতা বৃদ্ধি করা;
- পরিবার পরিকল্পনা, মাসিক নিয়মিতকরণ, জরুরি গর্ভনিরোধক ও গর্ভপাত পরবর্তী সেবা প্রদানের দক্ষতা বৃদ্ধি করা;
- কৈশোরে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং বাল্য বিবাহ বিষয়ে জ্ঞান ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা;
- প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ, যৌনবাহিত সংক্রমণ, এইচআইভি-এইডস, জরায়ুমুখের ক্যান্সার এবং স্তন ক্যান্সার সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা প্রদান করা;
- যৌন ও জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা এবং নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন সম্পর্কে জ্ঞান ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা;
- পরিবার পরিকল্পনা সেবার তথ্য সংরক্ষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়নের দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

সূচিপত্র

অধ্যায়-১ যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য, অধিকার এবং জেন্ডার সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা---------- ২৩

অধ্যায়-২ আচরণ পরিবর্তনে যোগাযোগ ও কাউন্সেলিং---------- ৪৫

অধ্যায়-৩ মাসিক (ঋতুচক্র) স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা---------- ৫৯

অধ্যায়-৪ কৈশোরে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং বাল্যবিবাহ ---------- ৬৯

অধ্যায়-৫ নিরাপদ মাতৃত্ব ও জরুরি প্রসূতি সেবা এবং নবজাতকের অত্যাবশ্যকীয় সেবা---------- ৮৩

অধ্যায়-৬ যৌন ও জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা এবং নারী ও শিশু নির্যাতন ---------- ৯৯

অধ্যায়-৭ পরিবার পরিকল্পনা, মাসিক নিয়মিতকরণ, জরুরি গর্ভনিরোধক বড়ি এবং গর্ভপাত পরবর্তী সেবা ---------- ১১১

অধ্যায়-৮ প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ, যৌনবাহিত সংক্রমণ এবং এইচআইভি ও এইডস; স্তন ও জরায়ুমুখের ক্যান্সার ------ ১৬৩

অধ্যায়-৯ পরিবার পরিকল্পনা সেবার তথ্য সংরক্ষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন ---------- ১৭৭

সংযুক্তি: ১ প্রশিক্ষণ সূচি ---------- ১৮১

সংযুক্তি: ২ কাউন্সেলিং-এর অনুশীলন চেকলিস্ট ---------- ১৮৫

সংযুক্তি: ৩ কাউন্সেলিং-এর অনুশীলন চেকলিস্ট---------- ১৮৭

সংযুক্তি: ৪ বিভাগীয় পর্যায়ে অবস্থিত ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেলের যোগাযোগের নম্বর---------- ১৮৯

সংযুক্তি: ৫ জেলা ও উপজেলা সদর হাসপাতালে অবস্থিত ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেলে যোগাযোগের নম্বর---------- ১৯১

সংযুক্তি: ৬ যৌন ও জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার ক্ষেত্রে সেবাপ্রদানকারী সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের তালিকা ------- ১৯৫

তথ্য সূত্র: ---------- ---------- ১৯৭

অধ্যায়-১

যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য, অধিকার এবং জেন্ডার সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা

যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য, অধিকার এবং জেন্ডার সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা

যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে আমাদের স্বাস্থ্য ও প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। স্বাস্থ্য এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে আমাদের পর্যাপ্ত ধারণা ও সঠিক জ্ঞানের অভাবে অনেকেই এসব বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন নন। ফলে বিভ্রান্তি ও স্বাস্থ্য সমস্যা তৈরি হয়। তাই সঠিক ধারণার জন্য শুরুতেই স্বাস্থ্য এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সংজ্ঞা জানা ও বোঝা প্রয়োজন। এতে আমাদের ধারণা আরও সুসংহত ও সমৃদ্ধ হবে।

স্বাস্থ্য (Health)

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-এর সংজ্ঞা অনুযায়ী- "স্বাস্থ্য হলো পরিপূর্ণ দৈহিক, মানসিক ও সামাজিক কল্যাণের একটি সার্বিক অবস্থা যা শুধুমাত্র রোগের, অসুস্থতার বা বিকলাঙ্গতার অনুপস্থিতি নয়"।

প্রজনন স্বাস্থ্য (Reproductive Health)

প্রজনন হচ্ছে সন্তান জন্মদানের প্রক্রিয়া। মানুষের সামগ্রিক স্বাস্থ্যের একটি বিশেষ অংশ হলো প্রজনন স্বাস্থ্য। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সংজ্ঞা অনুসারে ১৯৯৪ সালে কায়রোতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক জনসংখ্যা সম্মেলনে গৃহীত প্রজনন স্বাস্থ্যের সংজ্ঞা হচ্ছে "প্রজনন স্বাস্থ্য বলতে শুধুমাত্র প্রজননতন্ত্রের কাজ এবং প্রজনন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত রোগ বা অসুস্থতা বা বিকলাঙ্গতার অনুপস্থিতিকেই বোঝায় না বরং শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক কল্যাণকর এক পরিপূর্ণ সুস্থ অবস্থার মধ্য দিয়ে কার্যকর প্রজনন প্রক্রিয়া সম্পাদনের একটি অবস্থাকে বোঝায়।"

প্রজনন স্বাস্থ্যের উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী

- সকল বয়সের নারী
- সকল বয়সের পুরুষ
- কিশোর-কিশোরী
- শিশু
- প্রতিবন্ধী
- উভলিঙ্গ (Inter sex), লিঙ্গ রূপান্তরকারী, তৃতীয় লিঙ্গ (Transgender)
- নৃ-গোষ্ঠী

চিত্র: সকল বয়সের নারী

চিত্র: সকল বয়সের পুরুষ

চিত্র: কিশোর-কিশোরী

চিত্র: শিশু

চিত্র: প্রতিবন্ধী

চিত্র: তৃতীয় লিঙ্গ

চিত্র: নৃ-গোষ্ঠী

চিত্র: গর্ভবতী নারী

প্রজনন স্বাস্থ্যের পরিধি

প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী মনে করা হয় যে, নারীদের বিশেষ যত্ন শুধুমাত্র গর্ভকালীন, প্রসবকালীন ও প্রসব পরবর্তী সময়েই নেওয়া দরকার। তবে একটি শিশুর জন্ম থেকে শুরু করে শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও প্রৌঢ়ত্ব প্রতিটি স্তরেই প্রজনন স্বাস্থ্যের বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অর্থাৎ শিশু থেকে বৃদ্ধ বয়সের সকল নারী-পুরুষ, উভলিঙ্গ, লিঙ্গ রূপান্তরকারী/তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী এবং নৃ-গোষ্ঠীসহ সকলেই প্রজনন স্বাস্থ্য সেবার আওতায় পড়ে।

প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা

প্রজনন স্বাস্থ্যের সংজ্ঞা অনুযায়ী "প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা হলো প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যাগুলোকে প্রতিরোধ ও সমাধান করার জন্য কিছু পদ্ধতি, কৌশল ও সেবাসমূহের সমাহার যা প্রজনন স্বাস্থ্য ও কল্যাণের জন্য সহায়ক"। যৌন স্বাস্থ্যও এই সেবার অন্তর্ভুক্ত। এর উদ্দেশ্য শুধুমাত্র প্রজনন এবং যৌনবাহিত সংক্রমণ ও রোগসমূহের পরামর্শ এবং সেবা-প্রদানই নয়, মানবজীবন এবং ব্যক্তিগত সম্পর্কেরও উন্নয়ন।

প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার গুরুত্ব

- জন্মের পরপরই শুরু হয়;
- সঠিক বৃদ্ধির জন্য শিশুবয়সেও বিশেষ যত্ন নিতে হয়;
- একজন পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য বয়ঃসন্ধিকালেও এই সেবার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন;
- প্রজননক্ষম বয়সে এই সেবার গুরুত্ব অপরিসীম;
- প্রজননক্ষম বয়সের পরেও এই সেবার বিশেষ গুরুত্ব আছে।

চিত্র: জন্মের পরপরই শুরু হয়

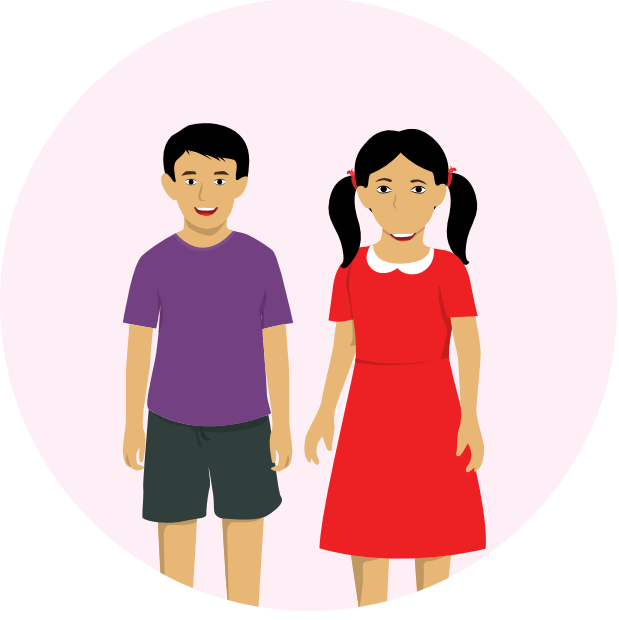

চিত্র: শিশু বয়সেও বিশেষ যত্ন নিতে হয়

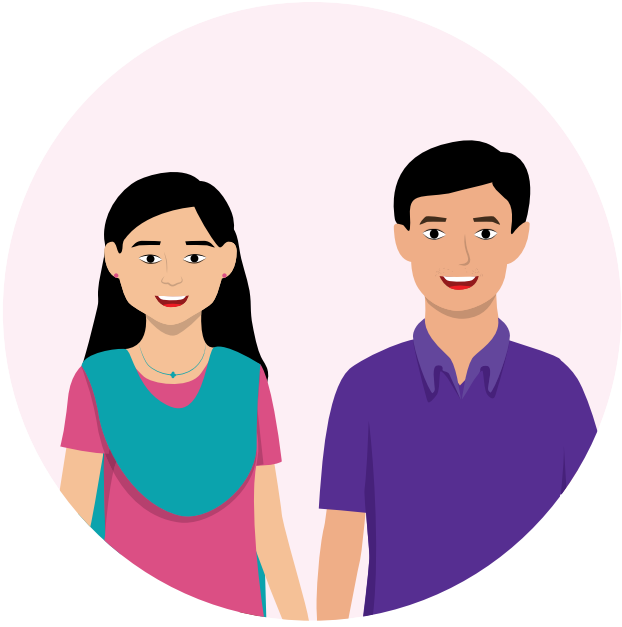

চিত্র: বয়ঃসন্ধিকালে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন

চিত্র: প্রজননক্ষম বয়সে এই সেবার গুরুত্ব অপরিসীম

চিত্র: পরবর্তী জীবনেও এ সেবার গুরুত্ব অনেক

প্রজনন স্বাস্থ্যের উপাদানসমূহ

স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা কর্মসূচির আওতায় প্রজনন স্বাস্থ্যের উপাদানগুলো হলো-

- নিরাপদ মাতৃত্ব
- পরিবার পরিকল্পনা
- প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ/যৌনবাহিত সংক্রমণ/এইডস
- মায়েদের পুষ্টি
- অনিরাপদ গর্ভপাত
- কিশোর-কিশোরীর স্বাস্থ্যসেবা
- বন্ধ্যাত্ব
- নবজাতকের সেবা।

চিত্র: নিরাপদ মাতৃত্ব

চিত্র: পরিবার পরিকল্পনা

চিত্র: প্রজননতন্ত্র সংক্রমণ/যৌনবাহিত রোগ/এইডস

চিত্র: মায়েদের পুষ্টি

চিত্র: অনিরাপদ গর্ভপাত

চিত্র: কিশোর-কিশোরীর স্বাস্থ্যসেবা

চিত্র: নবজাতকের সেবা

প্রজনন অধিকার

- প্রজনন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সঠিক তথ্য পাওয়ার অধিকার;
- প্রজনন সংক্রান্ত বিষয়ে কোনো বৈষম্য, জোর জবরদস্তি বা সহিংসতা ছাড়াই সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার;
- সন্তান নেয়া বা না নেয়া এবং নিলে তার সময় ও সংখ্যা নির্ধারণের অধিকার;
- প্রজনন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আইনসম্মত নিরাপদ, কার্যকর এবং গ্রহণযোগ্য পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি সম্পর্কে জানার ও পদ্ধতি বেছে নেওয়ার অধিকার;
- নিরাপদ মাতৃত্বের জন্য গর্ভাবস্থায় ও সন্তান জন্মদানের সময় ও প্রসব পরবর্তী প্রয়োজনীয় সেবা পাওয়ার অধিকার;
- প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ ও রোগের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পাওয়ার অধিকার।

চিত্র: জনগণের সন্তোষজনক ও নিরাপদ যৌনজীবন উপভোগ করার অধিকার

চিত্র: সন্তান জন্মানোর ক্ষমতা এবং কখন কিভাবে তা সম্পাদিত হবে স্বাধীনভাবে সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার

চিত্র: প্রজনন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আইনসম্মত নিরাপদ, কার্যকর এবং গ্রহণযোগ্য পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি সম্বন্ধে জানার ও বেছে নেওয়ার অধিকার

চিত্র: নিরাপদ মাতৃত্বের জন্য প্রয়োজনীয় সেবা পাওয়ার অধিকার

চিত্র: এ সম্পর্কে সকল জনগোষ্ঠির সঠিক তথ্য পাওয়ার অধিকার

যৌন অধিকার

- যৌন স্বাস্থ্য বিষয়ে সঠিক তথ্য পাওয়ার অধিকার;
- যৌন স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রয়োজনীয় সেবা পাওয়ার অধিকার;
- সন্তোষজনক ও নিরাপদ যৌন জীবন উপভোগ করার অধিকার;
- পছন্দমাফিক বিয়ের স্বাধীনতা ও যৌনসঙ্গী নির্বাচন করার অধিকার;
- নিরাপদ ও তৃপ্তিদায়ক যৌন সম্পর্ক স্থাপনের অধিকার;
- যৌন সক্ষমতা ও যৌন স্বাধীনতা ভোগ করার অধিকার;
- যৌনবাহিত সংক্রমণ ও রোগের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পাওয়ার অধিকার।

যৌন স্বাস্থ্য (Sexual Health)

মানুষের স্বাস্থ্যগত বিষয়গুলো যখন যৌনাঙ্গ ও যৌনতার সাথে সম্পর্কিত তখনই তাকে যৌন স্বাস্থ্য বলে। এটি এমন একটি বিষয় যা নিজের ও অন্যের যৌনতার এবং যৌন সম্পর্কের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে তার ব্যক্তিত্বকে সমৃদ্ধ হতে, ভালবাসার প্রকাশ ঘটাতে এবং আনন্দ বা তৃপ্তি পেতে সাহায্য করে। যেমন, জোরপূর্বক যৌন সম্পর্ক স্থাপন থেকে বিরত থাকা, কারো প্রতি বৈষম্য না দেখানো এবং অন্যের প্রতি সহিংস না হওয়া ইত্যাদি।

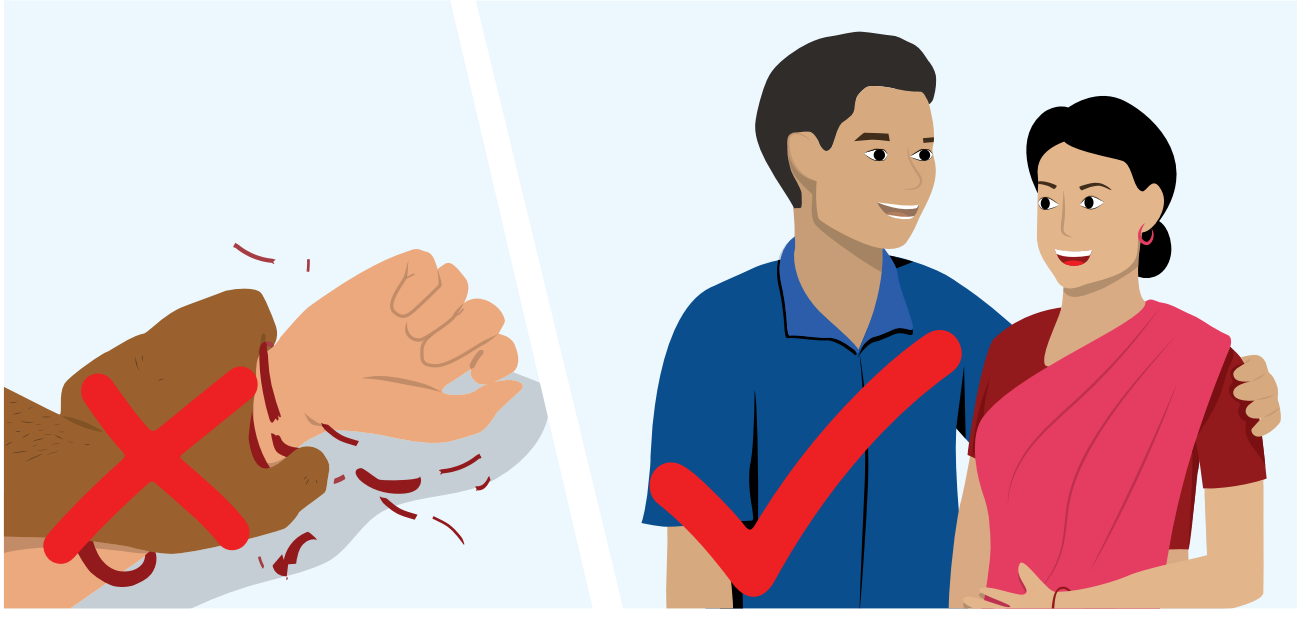

চিত্র: জোরপূর্বক যৌন সম্পর্ক স্থাপন থেকে বিরত থাকা

চিত্র: কারো প্রতি বৈষম্য না দেখানো

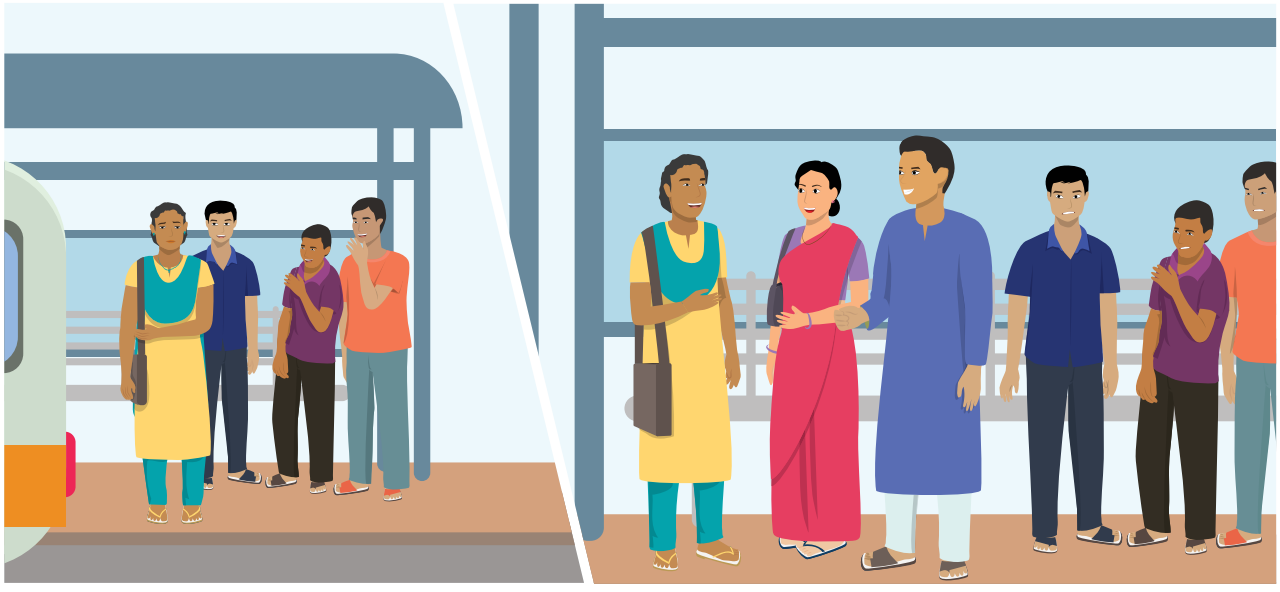

চিত্র: অন্যের প্রতি সহিংস না হওয়া

লিঙ্গ (Sex)

'লিঙ্গ' নারী, পুরুষ ও উভলিঙ্গের শারীরিক পার্থক্য বুঝায়। নারী ও পুরুষের মধ্যে আকৃতি ও প্রকৃতিগত কিছু শারীরিক পার্থক্য রয়েছে। স্থান, কাল ও সমাজভেদে এসব পরিবর্তন হয় না। যেমন- নারী গর্ভধারণ করতে এবং সন্তানকে দুধ খাওয়াতে পারে কিন্তু পুরুষ তা পারে না। উভলিঙ্গের মানুষ বলতে এমন একজন ব্যক্তিকে বোঝায় যার যৌন ক্রোমজোম, যৌনাঙ্গ বা যৌন সম্পর্কিত বৈশিষ্ট্য পুরোপুরি চিহ্নিত করে বলা যায় না যে সে পুরুষ বা নারী।

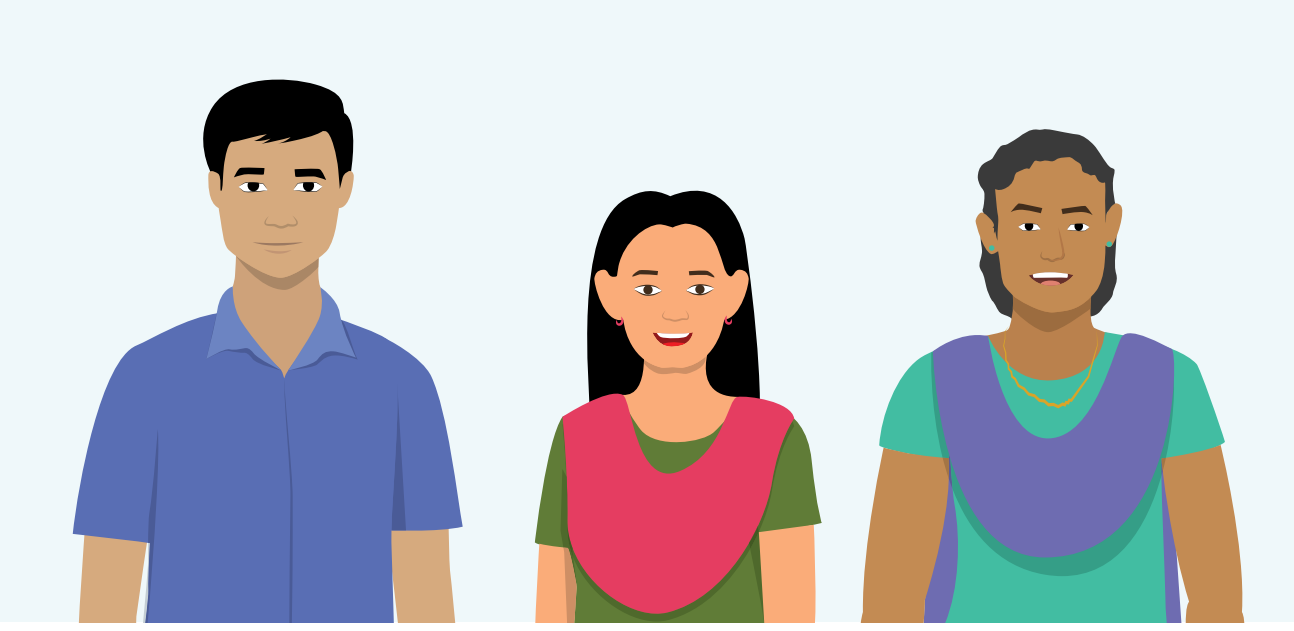

জেন্ডার (Gender)

সমাজ কর্তৃক সৃষ্ট নারী-পুরুষের মধ্যকার পার্থক্যই হলো 'জেন্ডার'। জন্মগতভাবে ছেলে ও মেয়েশিশুর মধ্যে লিঙ্গগত পার্থক্য ছাড়া আর কোনো পার্থক্য না থাকলেও পরবর্তীতে সামাজিক রীতিনীতির কারণে নারী ও পুরুষের মধ্যে আচার-আচরণ ও ভূমিকার ক্ষেত্রে ব্যাপক পার্থক্য দেখা যায়। সামাজিকভাবে তৈরি নারী ও পুরুষের পরিচয়, তাদের মধ্যকার সম্পর্ক এবং ভূমিকাকেই জেন্ডার বলা হয়। জেন্ডার সম্পর্কে সমাজের কাছ থেকে আমরা যে ধারণা এবং তথ্য লাভ করি তার উপর ভিত্তি করে আমাদের আচার-আচরণ গঠিত হয়। সমাজে আমাদের ভূমিকা কী হবে তা আমাদের শৈশব থেকেই শেখানো হয়। সমাজ থেকে প্রাপ্ত এসব ধারণা এবং সামাজিক প্রচলিত রীতিনীতি ও নৈতিকতা থেকে জেন্ডার ভূমিকা নির্ধারিত হয়। জেন্ডার পার্থক্যের কারণে মানুষের সুযোগ-সুবিধা, জীবনের পছন্দ-অপছন্দ কোনো কোনো সময় সীমিত হয়ে পড়ে। জেন্ডার বৈষম্যের কারণে প্রায়ই নারী, উভলিঙ্গ, লিঙ্গ রূপান্তরকামী, তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ বিভিন্নভাবে বৈষম্য ও প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়।

লিঙ্গ এবং জেন্ডারের মধ্যে পার্থক্য

ক্রমিক	লিঙ্গ	জেন্ডার
১.	শারীরিক	সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মনস্তাত্ত্বিক
২.	জন্মগত	অর্জিত/অর্পিত
৩.	সার্বজনীন বা সমগ্র বিশ্বে একই রকম	সমাজ সংস্কৃতিভেদে ভিন্ন
৪.	সাধারণত অপরিবর্তনশীল	ইচ্ছা করলে পরিবর্তন করা যায়
৫.	স্থান, কাল, পাত্রভেদে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না।	স্থান, কাল, পাত্রভেদে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

যৌনতা (Sexuality)

যৌনতা মানবসত্তার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ যা যৌন চাহিদা, আকাঙ্খা, আনন্দ, যৌন সম্পর্ক, প্রজনন এবং জেন্ডারের সাথে সম্পর্কিত। এটি এমন একটি বিষয় যা মানুষের চিন্তায়, কল্পনায়, আকাঙ্খায়, বিশ্বাসে, মূল্যবোধে, দৃষ্টিভঙ্গিতে, আচরণে, অভ্যাসে এবং পারস্পরিক সম্পর্কের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। মানব জীবনে জৈবিক, মানসিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রভাব, নৈতিকতা, আইন, ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক বিষয়গুলির মাধ্যমে যৌনতা প্রভাবিত হয়।

যৌন বৈচিত্র্য (Sexual diversity)

ব্যক্তি বিশেষে যৌনতার ধরন বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। যৌন বৈচিত্র্য বলতে বুঝায় প্রতিটি মানুষের নিজস্ব আলাদা যৌন চাহিদা। যৌনতা হতে পারে কোন ব্যক্তির সমলিঙ্গের, বিপরীত লিঙ্গের বা উভয়লিঙ্গের প্রতি যৌন চাহিদা পূরণের আকর্ষণ যা যৌন প্রবণতা (sexual orientation) নামে অভিহিত।

যৌনতার ভিন্নতা

যৌনতার ভিন্নতার বহু উদাহরণ রয়েছে। মূলত যে সকল ভিন্নতা সচরাচর পরিলক্ষিত হয় তা এখানে আলোচনা করা হলো-

সমকামিতা (Homosexuality)

- যদি কোনো ব্যক্তি একই লিঙ্গের (সমলিঙ্গের) আরেক ব্যক্তির প্রতি দৈহিক ও মানসিকভাবে আবেগ বা যৌন আকর্ষণ অনুভব করে এবং যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে তাহলে তাকে 'সমকামিতা' বলা হয়। যারা সমকামিতায় অভ্যস্ত তাদের সমকামী বলা হয়। সমকামিতা নারী ও পুরুষ উভয়ের মধ্যে থাকতে পারে।

উভকামিতা (Bisexuality)

- কোনো ব্যক্তি যখন উভয়লিঙ্গের প্রতি অর্থাৎ নারী ও পুরুষের প্রতি দৈহিক ও মানসিকভাবে আবেগ বা যৌন আকর্ষণ অনুভব করে এবং যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে তাহলে তাকে উভকামিতা বলা। যারা উভকামিতায় অভ্যস্ত তাদের উভকামী বলা হয়। উভকামিতাও নারী এবং পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে হতে পারে।

বিপরীতকামিতা (Heterosexuality)

- যদি কোনো ব্যক্তি শুধু বিপরীত লিঙ্গের ব্যক্তির প্রতি দৈহিক ও মানসিকভাবে আবেগ বা যৌন আকর্ষণ অনুভব করে এবং যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে তাহলে সেটাই হলো 'বিপরীতকামিতা'। যাদের মধ্যে বিপরীতকামিতা আছে তারা বিপরীতকামী হিসেবে পরিচিত। এই যৌন ভিন্নতা শুধু নারী ও পুরুষের মধ্যকার যৌন সম্পর্ক বুঝায়। সমাজের অধিকাংশ মানুষই বিপরীতকামী।

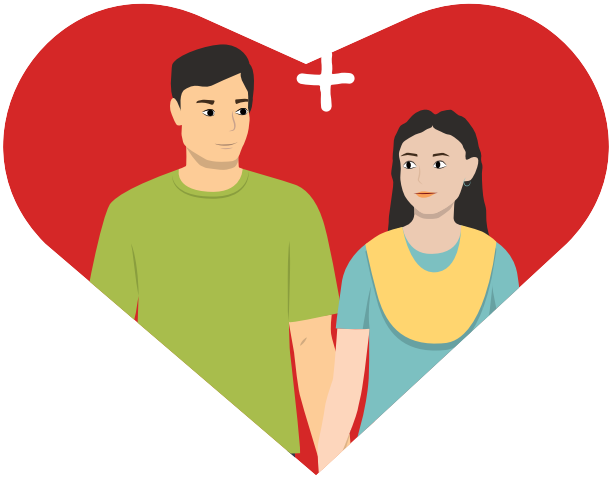

চিত্র: বিপরীতকামী

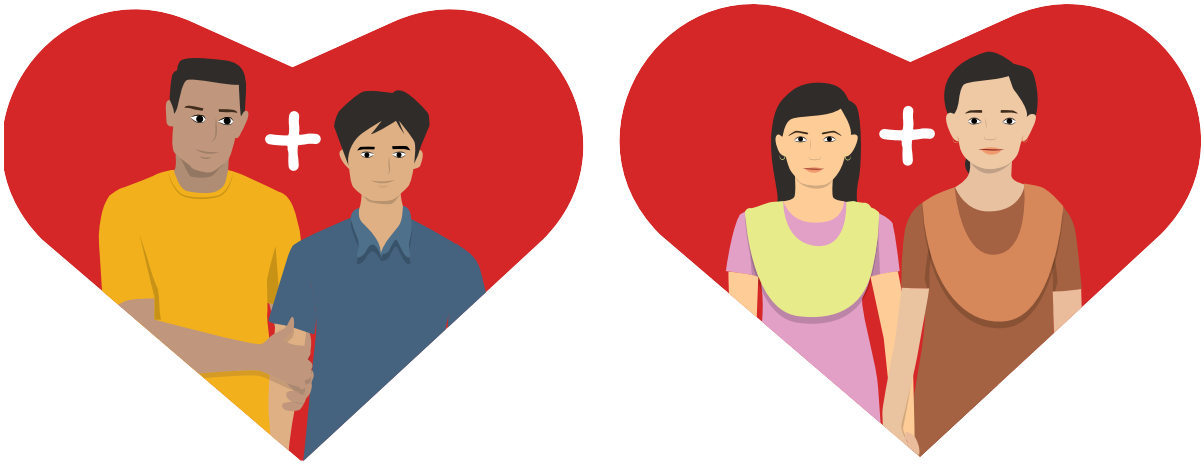

চিত্র: সমকামী

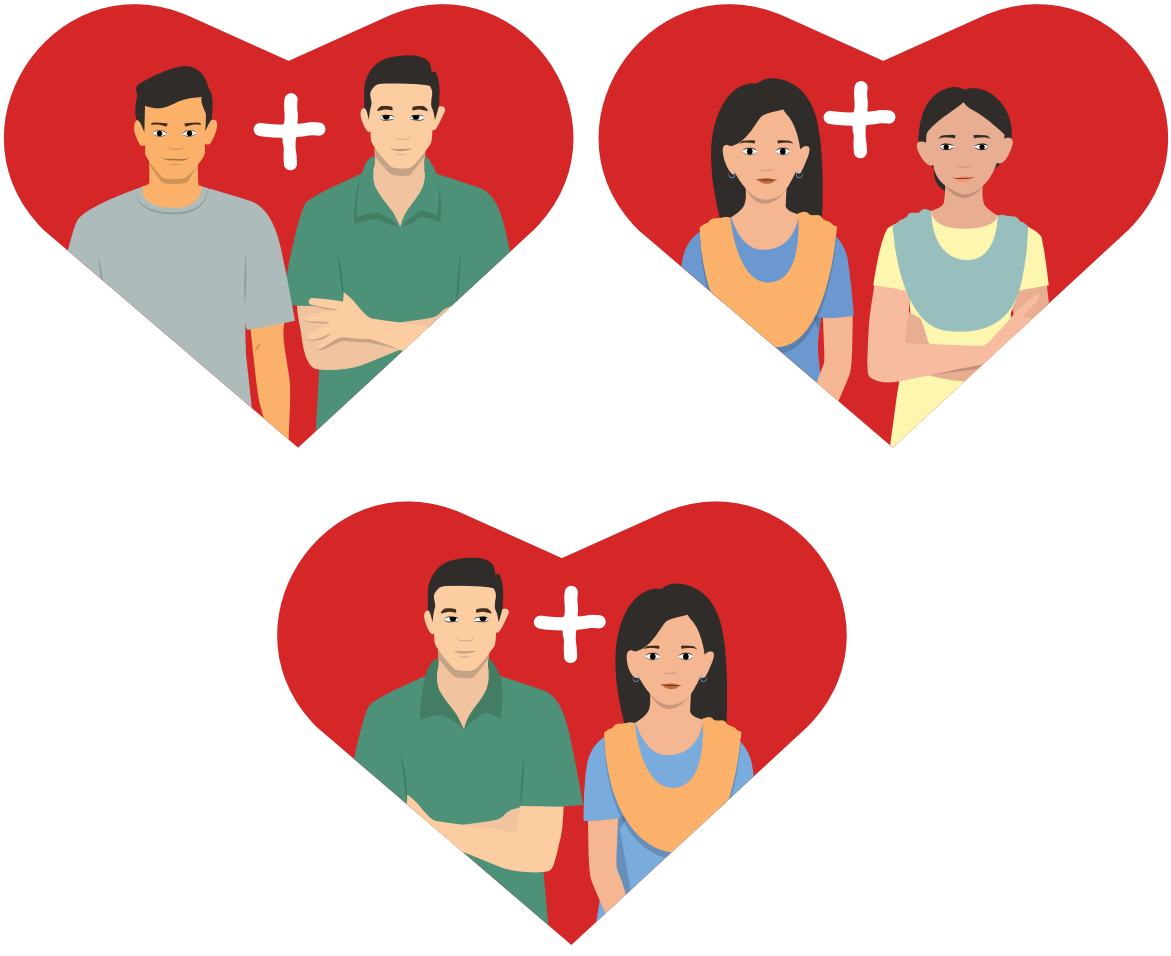

চিত্র: উভকামী

জেন্ডার বৈচিত্র্য (Gender Diversity)

লিঙ্গ পরিচয়ের ভিত্তিতে মানব জাতি প্রধানত নারী ও পুরুষ-এই দুই শ্রেণিতে বিভক্ত। যেসব মানুষের লিঙ্গ পরিচয় সুনির্দিষ্টভাবে শনাক্ত করা যায় না, অর্থাৎ যাদের জনন অঙ্গ ও অপরাপর বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে সম্পূর্ণ পুরুষ বা নারী হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না, তাদের 'তৃতীয় লিঙ্গ' নামে অভিহিত করা হয়। প্রথাগতভাবে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের হিজড়া বলা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২৭ অনুচ্ছেদে বর্ণিত 'আইনের দৃষ্টিতে সকল নাগরিকের সমান অধিকার' নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সরকার ২০১৩ সালের ১১ নভেম্বর হিজড়া জনগোষ্ঠীকে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ হিসেবে রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। ফলে এখন তারা জাতীয় পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট ও অন্য সব সরকারি-বেসরকারি নথিপত্রে তৃতীয় লিঙ্গের নাগরিক হিসেবে পরিচিত হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, হিজড়া আমাদের সমাজে অবহেলিত ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠী হিসেবে আদিকাল থেকে বিদ্যমান। এছাড়া শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী এবং নৃ-গোষ্ঠীর নারীদের বিষয়েও প্রয়োজনীয় সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

বেশিরভাগ তৃতীয় লিঙ্গের শিশুই পরিণত বয়সে উপনীত হওয়ার আগেই তার পরিবার থেকে বিতাড়িত হয়ে বা স্বেচ্ছায় নির্বাসিত হয়ে আমাদের সমাজ ছেড়ে ছিন্নমূল তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠীর সঙ্গে বসবাস করতে শুরু করে। ফলে আমাদের সমাজে বেড়ে ওঠে বঞ্চিত তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠী। এই বঞ্চনার দুর্ভেদ্য দেয়াল অতিক্রম করে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং অন্যান্য মানবিক সুবিধা প্রায়ই এদের কাছে পৌঁছায় না বললেই চলে। ফলে আমাদের সংস্কৃতির সঙ্গে তৃতীয় লিঙ্গ সম্প্রদায়ের পথচলা কখনো সমান্তরাল হয় না। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার অনুপস্থিতি, কর্মসংস্থানের অনিশ্চয়তা এবং সর্বোপরি সামাজিক অবহেলা তাদের মানবিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত করে। তৃতীয় লিঙ্গদের সম্পর্কে পরিবারিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে হবে। তৃতীয় লিঙ্গদের তাদের নিজ নিজ পরিবার ও সমাজের সংস্কৃতির মধ্যে বেড়ে ওঠার সুযোগ তৈরি করে দিতে হবে। এজন্য প্রয়োজনীয় সচেতনতামূলক কর্মসূচিসহ সেবা-প্রদান নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

অধ্যায়-২

আচরণ পরিবর্তন যোগাযোগ ও কাউন্সেলিং

আচরণ পরিবর্তন যোগাযোগ ও কাউন্সেলিং

আচরণ পরিবর্তনে যোগাযোগ হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যা স্বীকৃত যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে শিক্ষামূলক তথ্যাদির সাহায্যে ব্যক্তির ও সমাজের আচরণ পরিবর্তনে সাহায্য করে। বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায় আমরা অনেকেই অনেক কিছু জানি, গুরুত্ব বুঝি কিন্তু চর্চা করি না। যেমন, হাত ধোয়ার বিষয়টি উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক। বর্তমানে কোভিড-১৯ রোগের কারণে আধা ঘণ্টা পর পর হাত ধোয়া, বাইরে থেকে বাসায় ফিরলে হাত ধোয়া ও খাবারের আগে হাত ধোয়ার ব্যাপক প্রচারের ফলে আমরা প্রায় সবাই হাত ধোয়া সম্পর্কে অবহিত হয়েছি। কিন্তু এখনও অনেকের সঠিকভাবে হাত ধোয়ার অভ্যাস হয়নি। এই উদাহরণ থেকে বোঝা যায়, আমরা অনেকেই হাত ধোয়া সম্পর্কে সচেতন, আমাদের জ্ঞান আছে কিন্তু আমাদের আচরণের পরিবর্তন হয়নি। সহজ কথায় বলা যায় মানুষের প্রচলিত ধ্যান ধারণা, বিশ্বাস, কুসংস্কার, মতামতসহ ও আচরণের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনতে সহজ, বোধগম্য ও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। এই পদক্ষেপ বা প্রক্রিয়াই হলো আচরণ পরিবর্তনে যোগাযোগ।

যোগাযোগ

আচরণ পরিবর্তন যোগাযোগ সম্পর্কে জানতে হলে আগে যোগাযোগ সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকা প্রয়োজন। আমাদের জানা তথ্য, ধারণা, বিশ্বাস, অভিজ্ঞতা ও মতামত সঠিকভাবে অর্থ সহকারে অন্যের কাছে গ্রহণযোগ্যভাবে বিনিময় করতে পারার প্রক্রিয়াই হলো যোগাযোগ। এই প্রক্রিয়ায় শুধু অন্যকে জানানোর বিষয়ই অন্তর্ভুক্ত থাকে না বরং অন্যের মতামত জানারও সুযোগ থাকে। যেকোনো যোগাযোগের ক্ষেত্রে ৫টি উপাদান অবশ্যই থাকতে হবে যা নিম্নে দেওয়া হলো

যোগাযোগ পদ্ধতি সাধারণত দুই ধরনের

১. আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ (Interpersonal Communication)
২. গণযোগাযোগ (Mass Communication)

আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ

আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ হচ্ছে মুখোমুখি, বাচনিক এবং অবাচনিক উপায়ে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে তথ্য অথবা অনুভূতি বিনিময়।

আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ দুই ধরনের

- **একান্ত যোগাযোগ**- এমন যোগাযোগ যেখানে একজন সরাসরি আরেকজনের সাথে যোগাযোগ করেন। যেমন; কাউন্সেলিং, মুখোমুখি কথা বলা, তথ্য বিনিময়, পরামর্শ, টেলিফোন, ইন্টারনেট ইত্যাদি।
- **দলীয় যোগাযোগ**- একটি দলের সাথে অপর একজন ব্যক্তি বা দলের সরাসরি যোগাযোগই হচ্ছে দলীয় যোগাযোগ। যেমন: উঠান বৈঠক, দলীয় সভা, দলীয় কাউন্সেলিং ইত্যাদি।

গণযোগাযোগ

একসাথে সমাজের সকল মানুষ বা বৃহৎ জনগোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ কার্যক্রমকে গণযোগাযোগ বলা হয়। গণযোগাযোগের ক্ষেত্রে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর কাছে বার্তা পৌঁছানো এবং তথ্য প্রচারের জন্য বিভিন্ন ধরনের মাধ্যম ব্যবহার করা হয় যা গণমাধ্যম হিসেবে পরিচিত। গণযোগাযোগে সাধারণত শ্রোতার সাথে বার্তা প্রেরণকারীর প্রত্যক্ষ সংযোগ ঘটে না, মতামত নেওয়ার সুযোগ থাকে না, প্রতিবার্তা পাওয়া যায় না।

যোগাযোগের মাধ্যম

আমরা মূলত তিন প্রকার মাধ্যমে যোগাযোগ করে থাকি-

১. **শ্রবণ মাধ্যম:** মুখোমুখি কথা বলা, টেলিফোন, ক্যাসেট, রেডিও, মাইকিং, পথসভা ইত্যাদি

২. **দর্শন মাধ্যম:** বই-পুস্তক, বুকলেট/লিফলেট, ফ্লিপ চার্ট, পোস্টার, সাংকেতিক চিহ্ন, আকার ইঙ্গিত, সংবাদপত্র, প্রদর্শন

৩. **শ্রবণ ও দর্শন মাধ্যম:** টেলিভিশন, পথনাটক, ভিডিও, চলচ্চিত্র।

একটি যোগাযোগ সফল হওয়ার জন্য ৪ R এর মাধ্যমে তুলে ধরা যায়-

R	সঠিক তথ্য/বার্তা প্রদান করে (Giving Right Message)
R	সঠিক ব্যক্তিকে (To Right Person)
R	সঠিক মাধ্যমের সাহায্যে (Through Right Channel)
R	সঠিক সময়ে (At Right Time)

অর্থাৎ সঠিক বার্তা, সঠিক ব্যক্তিকে সঠিক মাধ্যমে সঠিক সময়ে দেওয়া সম্ভব হলেই যোগাযোগ কার্যকর হয়।

সামাজিক রীতিনীতি ব্যক্তির আচরণ পরিবর্তনকে প্রভাবিত করে। এজন্য গণযোগাযোগ, আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ নিশ্চিত করে সামাজিক সমর্থন আদায় করতে হয়। স্থানীয় জনসাধারণ, রাজনৈতিক নেতা, নীতি নির্ধারক এবং ধর্মীয় নেতা, শিক্ষক আচরণ পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী হতে পারেন। তারা জনগোষ্ঠীর আচরণ পরিবর্তনে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারেন। জনগণের স্বীকৃতি, সন্তুষ্টি গ্রহণকারীদের মাধ্যমে প্রচারণা ও সহযোগিতার মাধ্যমে অ্যাডভোকেসি হচ্ছে আচরণ পরিবর্তন প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ ও শেষ ধাপ। ব্যবহারকারী কোনো সেবা গ্রহণ করে সন্তুষ্ট হলে তিনি ঐ সেবার পক্ষে কথা বলেন।

আচরণ

মানুষ যখন কোনো কিছু দেখে, শুনে বা অনুধাবন করে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে সেটাই তার আচরণ। কথা-বার্তা, অঙ্গভঙ্গি, অভিব্যক্তি ও নানা কাজের মধ্য দিয়ে আচরণ প্রকাশ পায়। সময়, পরিবেশ ও পরিস্থিতির ভিন্নতার কারণে আচরণের তারতম্য ঘটে। মানুষ তার জ্ঞান, বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার আলোকে নিজের আচরণ ব্যক্ত বা নিয়ন্ত্রণ করে। শারীরিক, মানসিক, আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা বা পরিমণ্ডলের উপরও ব্যক্তির আচরণ নির্ভর করে।

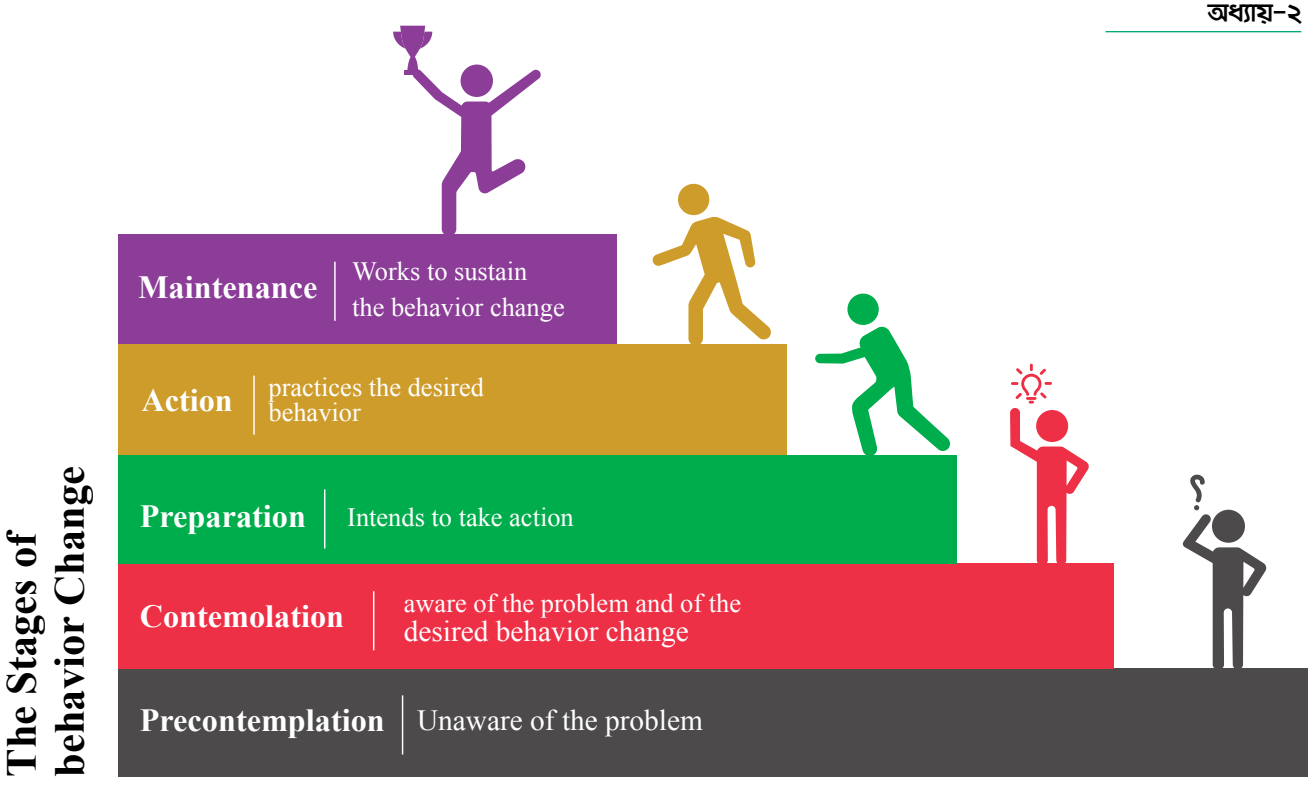

পরিবর্তন

তথ্য, ধারণা, বিশ্বাস, অভিজ্ঞতা ও মতামত সঠিক এবং গ্রহণযোগ্যভাবে বিনিময়ের ফলে গ্রহীতার দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণের যে স্থায়ী বা অস্থায়ী পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তাকে পরিবর্তন বলা হয়। নতুন তথ্য ও জ্ঞানের মাধ্যমে নিজের বা পরিবারের জন্য সুবিধাজনক বা উপকারমূলক মনে করলে সেই মানুষের মনে পরিবর্তনের ইচ্ছা জাগে এবং তারা নিজের দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ পরিবর্তন করে এই পরিবর্তন দীর্ঘস্থায়ী হলে তা অভ্যাসে পরিণত হয়।

আচরণ পরিবর্তনের ধাপ

কোনো ব্যক্তিকে উন্নততর পর্যায়ে পৌঁছার জন্য পর্যায়ক্রমে পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হতে হয়। এই বিবর্তনের ধারাকে 'ট্রানজিশনাল' রোল বা মধ্যবর্তী সময়ের আচরণ বলে। 'আচরণ পরিবর্তনের' এই অবকাঠামোকে 'আচরণ পরিবর্তনের ধাপ' বলা হয়।

১. জ্ঞান (Knowledge):

- সেবা সংক্রান্ত বার্তা যেমন- মাতৃস্বাস্থ্য, শিশুস্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা বা যেকোনো বার্তা
- পুষ্টি, মাতৃস্বাস্থ্য, শিশুস্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বা যেকোনো বার্তার বিষয়বস্তু বুঝতে পারা
- পুষ্টি, মাতৃস্বাস্থ্য, শিশুস্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি অথবা অন্য কোনো সেবা প্রাপ্তির উৎস সম্পর্কে বলতে পারা।

২. অনুমোদন (Approval):

- মাতৃস্বাস্থ্য, শিশুস্বাস্থ্য, পুষ্টি, ও পরিবার পরিকল্পনা বা কোনো বার্তার পক্ষে সাড়া দেওয়া
- পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অথবা অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে বন্ধু-বান্ধব অথবা পরিবারের সদস্যদের সাথে আলোচনা করা
- বার্তার বিষয় সম্পর্কে পরিবার, বন্ধু-বান্ধব ও কমিউনিটি সমর্থন করে কি না তা চিন্তা করা
- মাতৃস্বাস্থ্য, শিশুস্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক তথ্য ও বার্তা নিজে অনুধাবন ও অনুমোদন করা

৩. ইচ্ছা (Intention):

- উপলব্ধি করা যে, পুষ্টি, মাতৃস্বাস্থ্য, শিশুস্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক বার্তা ও সেবা পরিবারের/ নিজেদের প্রয়োজন মেটাতে পারে
- মনের মধ্যে নিজের জন্য ও পরিবারের সদস্যদের জন্য পুষ্টি, মাতৃস্বাস্থ্য, শিশুস্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা গ্রহণ করার ইচ্ছা জাগা
- বিষয়টি নিয়ে সেবাপ্রদানকারীর সাথে আলোচনার ইচ্ছা পোষণ করা।

৪. চর্চা (Practice):

- সেবা গ্রহণের জন্য সেবা কেন্দ্রে যাওয়া, সেবাপ্রদানকারীর সাথে যোগাযোগ ও আলোচনা করা
- পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি বা স্বাস্থ্যসেবা নির্ধারণ ও এর ব্যবহার বা গ্রহণ শুরু করা
- পদ্ধতি ব্যবহার বা সেবা গ্রহণ চালিয়ে যাওয়া।

৫. অ্যাডভোকেসি (Advocacy):

- কমিউনিটির জনগণের সাথে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি বা স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করা ও সেবাটির সুবিধা স্বীকার করা
- অন্যান্যদের সেবা নিতে উৎসাহী করা
- কমিউনিটির সেবা কর্মসূচিতে সার্বিক সহযোগিতা করা।

ব্যক্তি ও দলের আচরণ, জ্ঞান স্তর থেকে কীভাবে অ্যাডভোকেসির স্তরে পৌঁছায়, আচরণ পরিবর্তনে যোগাযোগের ধাপের মাধ্যমে তা বোঝা যায়। মূলত আচরণ পরিবর্তন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। মানুষের আচরণ পরিবর্তন করা হচ্ছে এই যোগাযোগের মূল লক্ষ্য।

আচরণ পরিবর্তনের আগে সাধারণত কতগুলো মাধ্যমিক স্তর অতিক্রম করতে হয়। দেখা গিয়েছে; সব মানুষ একইভাবে একই গতিতে অথবা একই সময়ে আচরণ পরিবর্তনের ধাপ অতিক্রম করতে পারে না। যেমন: কেউ কেউ পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি সম্পর্কে জানার আগেই পরিবার সীমিত রাখে। অপরদিকে কেউ কেউ পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি সম্পর্কে জানে, অনুমোদন করে, কিন্তু অনেক পরে তারা অনুশীলন বা ব্যবহার করে। আবার অনেকে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ধাপ হতে পরিবার পরিকল্পনা জ্ঞান লাভ করে। সেবাপ্রদানকারী হিসেবে আমাদের কাজ হবে সেবা গ্রহীতা, আচরণ পরিবর্তনের কোন ধাপে রয়েছে এবং সেখান থেকে আমরা কীভাবে তাকে পরবর্তী ধাপে নিতে পারি সেই প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা এবং যে সেবাগ্রহণকারী অ্যাডভোকেসি করছেন তার সঙ্গেও যোগাযোগ রেখে তাকে আরও উৎসাহী করা।

কাউন্সেলিং

কাউন্সেলিং একটি সুচারু এবং অত্যাবশ্যকীয় যোগাযোগ প্রক্রিয়া। কাউন্সেলিং ইংরেজি শব্দ। সামগ্রিক অর্থে কাউন্সেলিং হলো একটি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া যেখানে গ্রহীতা কোনো বিষয়ে আগ্রহী হয়ে খোলাখুলি আলাপ-আলোচনা করে ভালো-মন্দ জেনে তার উপকারের জন্য বা সমস্যা সমাধানের জন্য আচরণ পরিবর্তনের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। কাউন্সেলিং-এর মাধ্যমে সেবাগ্রহীতা (গর্ভবতী মহিলা, দুগ্ধদানকারী মা, কিশোর-কিশোরী, নারী-পুরুষ) ও বাড়িতে পরিচর্যাকারীর সমস্যাগুলো মনোযোগ দিয়ে শোনা, তাকে সহানুভূতি দেখানো ও সমাধানে সহায়তা দেওয়া হয়। তারপর যুক্তি, তথ্য ও পরামর্শের মাধ্যমে সমস্যাসমূহ নিরসনের উপায়গুলো সেবাগ্রহীতাকে জানানো ও ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করা।

কাউন্সেলিং হচ্ছে মুখোমুখি যোগাযোগের একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি জেনে শুনে ও বুঝে তার প্রয়োজনমতো ইতিবাচক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং সেই অনুযায়ী কাজ করার জন্য একজন কাউন্সেলর সেই ব্যক্তিকে তার সমস্যা চিহ্নিত করতে ও তা সমাধানে সাহায্য করে থাকেন। কাউন্সেলিং-এ কখনো কোনো ব্যক্তির উপর কিছু চাপিয়ে দেওয়া যাবে না, ব্যক্তি নিজেই স্বতঃস্ফুর্তভাবে সিদ্ধান্ত নিবে। যিনি কাউন্সেলিং নিতে আসেন তাকে ক্লায়েন্ট বা সেবাগ্রহীতা বলা যায়।

যিনি এই কাজ করেন তাকে কাউন্সেলর বলা হয়। কাউন্সেলিং একটি পেশা। আমাদের দেশে এখনো এই পেশা জনপ্রিয়তা লাভ করেনি। তবে ইদানিং অনেক প্রতিষ্ঠানে কাউন্সেলর পদ সৃষ্টি করা হয়েছে।

কাউন্সেলিং-এর গুরুত্ব

- আত্মবিশ্বাস অর্জন করতে সহায়তা করে
- সমস্যা সমাধানে সাহায্য করে
- কোনো ভুল ধারণা দূর করতে সাহায্য করে
- আচরণ পরিবর্তনে বা নতুন কোনো আচরণ গ্রহণে সহায়তা করে

কাউন্সেলরের কাজ

- শোনা- শেখার জন্য শুনুন (Listen to Learn) শুনতে শিখুন (Learn to Listen)
- প্রশ্ন করা
- প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করা
- বাস্তবভিত্তিক পরামর্শ প্রদান করা
- আবেগজনিত সমর্থন প্রদান করা

কাউন্সেলরের কাজ নয়

- উপদেশ দেওয়া
- সমস্যার সমাধান করা
- সিদ্ধান্ত দেওয়া

কারা কাউন্সেলর হতে পারেন

যারা সরাসরি সেবা প্রদানের জন্য দায়িত্বশীল তারা সবাই কাউন্সেলর হতে পারেন, যেমন-

- ডাক্তার
- নার্স
- সাব-অ্যাসিসটেন্ট কমিউনিটি মেডিক্যাল অফিসার
- প্যারামেডিক
- পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা (এফডব্লিউভি)
- পরিবার কল্যাণ সহকারী (এফডব্লিউএ)
- শিক্ষক
- আইনজীবি
- কাজী
- পেশাজীবি কাউন্সেলর
- অন্যান্য

তবে পেশাগতভাবে কাউন্সেলিং-এর জন্য অবশ্যই দক্ষতা ও জ্ঞান দুটোই প্রয়োজন। এজন্য কাউন্সেলিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ থাকা জরুরি।

কাউন্সেলিং-এর প্রয়োজনীয়তা

- কাউন্সেলিং সেবাপ্রদানকারীর সাথে সেবাগ্রহীতার কার্যকর যোগাযোগ সহজতর করে।
- কাউন্সেলিং একটি পরিবারের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে বুঝে তাদের চাহিদা মত প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিতে সাহায্য করে।
- কাউন্সেলিং সেবার ক্ষেত্রে যে সকল বাধা রয়েছে তা সঠিকভাবে নিরুপণ করে এবং তার সঠিক ও প্রাসঙ্গিক সমাধান দিতে সাহায্য করে।
- কাউন্সেলিং-এর মাধ্যমে একজন সেবাগ্রহণকারী সেবা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য জানতে পারেন এবং এগুলোর ব্যবহার নিশ্চিত করতে উৎসাহী হন।
- কাউন্সেলিং সেবাগ্রহীতার মনোবল বৃদ্ধি করে।
- কাউন্সেলিং সেবাগ্রহীতাকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে।

সফল কাউন্সেলিং-এর জন্য যেসব করণীয় বিষয় মনে রাখতে হবে

- **ব্যক্তির সামর্থ্য এবং সীমাবদ্ধতা মেনে নেওয়া:** গ্রহীতা ব্যক্তিকে সম্মান দেখানো এবং তার আচরণ ও মেধার সামর্থ্য এবং সামাজিক অবস্থান মেনে নিয়ে তাকে গুরুত্ব দিতে হবে। তাহলে ব্যক্তি এবং কাউন্সেলরের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা ও সমঝোতার পরিবেশ সৃষ্টি হবে। ব্যক্তির সাংস্কৃতিক ভিন্নতা ও মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে।
- **ব্যক্তি পর্যায়ে গুরুত্ব দেওয়া:** প্রত্যেক ব্যক্তিকে সকল পর্যায়ে গুরুত্ব দিতে হবে। তার বিভিন্ন গুণ ও সামর্থ্য এবং তার অবস্থার যে স্বাতন্ত্র রয়েছে তা বিবেচনায় নিতে হবে।
- **গোপনীয়তা রক্ষা করা:** সেবাগ্রহীতার গোপনীয়তা অবশ্যই কাউন্সেলরকে বজায় রাখতে হবে এবং এর প্রতি সম্মান দেখাতে হবে। একজন ব্যক্তির সমস্যা অন্যের কাছে কখনো প্রকাশ করা যাবে না।
- **ব্যক্তিগত পছন্দ চাপিয়ে না দেওয়া:** কাউন্সেলরের নিজস্ব মতামত কখনও ক্লায়েন্টের উপর চাপিয়ে দেওয়া উচিত হবেনা- বরং ব্যক্তিকে সমস্ত তথ্য ভালোভাবে জানাতে হবে এবং তার ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দকে মূল্য দিতে হবে।
- **ব্যক্তির অনুভূতির প্রতি সহানুভূতিশীল ও সহমর্মী হওয়া:** কাউন্সেলরের এমন কিছু বলা বা করা উচিত হবে না যা ব্যক্তির মনে বা তার অনুভূতিতে আঘাত করে। কাউন্সেলিং-এর সময় ব্যক্তির আবেগ ও অনুভূতির প্রতি সহানুভূতি ও সহমর্মিতা প্রদর্শন করতে হবে।
- **ব্যক্তিগত পক্ষপাত না করা:** আলোচ্য বিষয় বা সেবাগ্রহীতা সম্পর্কে কাউন্সেলর কোনো রকম পক্ষপাতিত্ব করতে পারবেন না। সবক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা বাজায় রাখতে হবে। কোনো পূর্ব-ধারণাকে প্রশ্রয় দেওয়াও ঠিক না।
- **অবহিত পছন্দের গুরুত্ব দেওয়া (Informed Choice):** কোনো বিষয়ের সুবিধা-অসুবিধা তার প্রকৃতি সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ তথ্য/বার্তা অবহিত করতে হবে যাতে সেবা গ্রহীতা সবকিছু জেনে নিজের পছন্দে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন।
- **ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত না করা:** ক্লায়েন্টের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা এবং এমন কথা বলা বা আচরণ করা ঠিক নয় যাতে সেবা গ্রহীতার ধর্মের প্রতি আঘাত বা অবমাননাকর মনে হয়।
- **স্বতঃস্ফূর্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে উৎসাহী করা (Voluntarism):** সেবাগ্রহীতা কোনো বিষয়ে দমন, (Coercion) বাধ্যবাধকতা, (Constrain) ও প্ররোচনা (Induce) ছাড়াই সকল তথ্য অবহিত হয়ে যেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন।

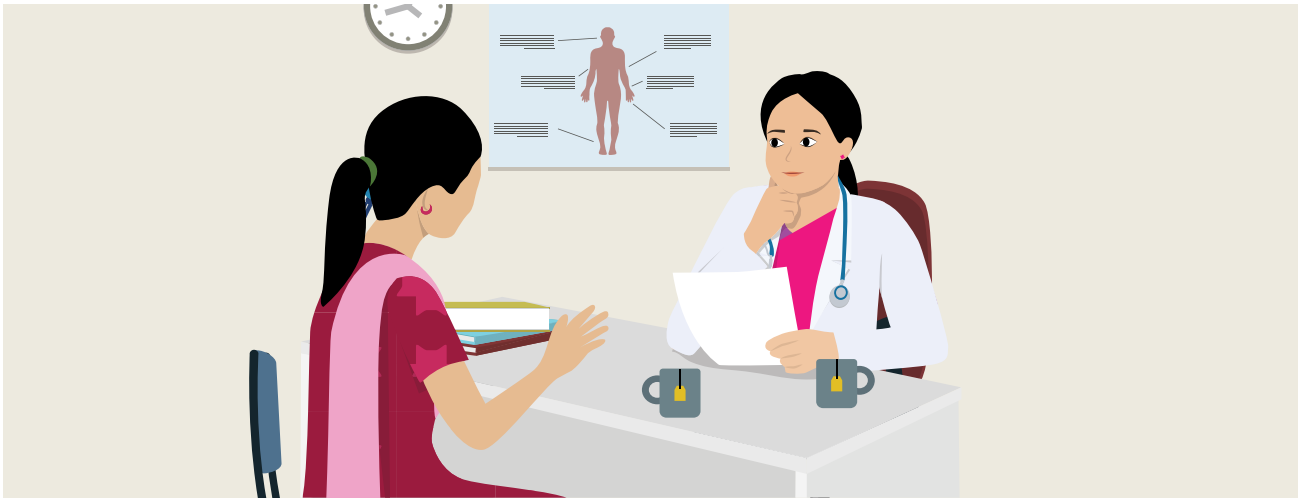

চিত্র: ব্যক্তিগত পছন্দ

চিত্র: ব্যক্তির অনুভূতির প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া

চিত্র: ব্যক্তিগত পক্ষপাত থাকা চলবে না

- **বিশেষ জনগোষ্ঠীর প্রতি বাড়তি দায়িত্বশীল হওয়া:** ব্যক্তির শারিরীক ও মানসিক প্রতিবন্ধীতা এবং নৃ-গোষ্ঠীগত, তৃতীয় লিঙ্গ ও ভিন্ন সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য মনে রাখা।

একজন আদর্শ কাউন্সেলরের যেসব গুণ থাকা প্রয়োজন

- সেবাগ্রহীতা সম্পর্কে আগ্রহী ও পরিস্থিতি সম্পর্কে জ্ঞানসম্পন্ন
- সমস্যা জানতে আগ্রহী ও ভালো শ্রোতা
- ধৈর্য্যশীল, তথ্য জানার জন্য প্রয়োজনীয় সময় ব্যয় করেন
- হাসি-খুশি থাকেন এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন
- সহানুভূতিশীল ও সত্যবাদী
- আস্থা অর্জনে সক্ষম
- গোপনীয়তা রক্ষা করেন এবং নির্ভরযোগ্য
- জেন্ডার বিষয়ে সচতেন থাকা
- মতামত, অনুভূতি ও সময়ের ব্যবহার সম্পর্কে নমনীয়।

একজন আদর্শ কাউন্সেলরের যা পরিহার করা উচিত

- ভাবাবেগ
- অনাবশ্যক কৌতুহলী হওয়া
- সব জানেন এমন ভাব দেখানো
- সেবাগ্রহীতার উপর সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া
- অতিরিক্ত সখ্যতা দেখানো (বিশেষ করে পুরুষ ও নারীর মধ্যে)
- সহানুভূতিহীনতা
- ধৈর্য্যহীনতা
- জ্ঞানার্জনে অনীহা
- গোপনীয়তা রক্ষায় অক্ষমতা।

কাউন্সেলিং-এর উপযোগী স্থান

১. **বাড়িতে কাউন্সেলিং:** বাড়ি পরিদর্শনের মাধ্যমে এই কাউন্সেলিং প্রদান করা হয়। বাড়িতে স্বামী-স্ত্রী ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের একসাথে দলীয়ভাবেও এই কাউন্সেলিং করা যায়। সাধারণ বিষয় যেমন, খাদ্য পুষ্টি, হাত ধোয়া বিষয়ে কাউন্সেলিং। আবার গোপনীয় বিষয়েও বাড়িতে নববধূ, কিশোরী ও গর্ভবতী মায়েদের গোপনীয়তা রক্ষা করে একান্ত কাউন্সেলিং করা সহজ হয়। নিজের বাড়িতে তারা কথা বলতে স্বাচ্ছন্দবোধ করেন।

২. **স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ক্লিনিক বা স্যাটেলাইট ক্লিনিকে কাউন্সেলিং:** সাধারণত স্বাস্থ্যকেন্দ্র, কমিউনিটি ক্লিনিক বা স্যাটেলাইট ক্লিনিকে একান্ত বা দলীয় কাউন্সেলিং করা যায়। কেউ একটি সেবা নিতে আসলে তাকে তার চাহিদা অনুযায়ী অন্যান্য সেবা নিতে আগ্রহী করা যায়। আবার অন্য কোনো শারীরিক, মানসিক সমস্যা আছে কি না তা যাচাই করে কাউন্সেলিং সেবা দেওয়া যায়।

চিত্র: বাড়ি কাউন্সেলিং

চিত্র: ক্লিনিক কাউন্সেলিং

চিত্র: কর্মক্ষেত্রে কাউন্সেলিং

চিত্র: খোলা জায়গায় কাউন্সেলিং

৩. **কর্মক্ষেত্রে কাউন্সেলিং:** শ্রমজীবি, কর্মজীবি ও পেশাজীবি মানুষের সময় ও চাহিদার কথা বিবেচনা করে তাদের কর্মস্থলে গিয়ে কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে তাদের সময় বাঁচে, কাজের ক্ষতি কম হয় এবং স্বাচ্ছন্দবোধ করেন।

৪. **খোলা জায়গায় কাউন্সেলিং:** অনেক সময় খোলা জায়গাও কাউন্সেলিং-এর জন্য চমৎকার স্থান হতে পারে। নিরিবিলি উঁচু স্থান, পাহাড়, নদীর পাড়, নির্জন মাঠ, কোলাহল মুক্ত জায়গাও কাউন্সেলিং-এর জন্য উপযুক্ত হতে পারে। লোক সমাগম কম বা নেই এমন প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষ সহজে তার মনের ভাব ও অনুভূতির প্রকাশ ঘটাতে পারে।

কাউন্সেলিং-এর উপযোগী পরিবেশ

- কাউন্সেলিং-এর জন্য উপযোগী পরিবেশ একান্ত আবশ্যক এবং নিম্নলিখিত বিষয়গুলো খেয়াল রাখা প্রয়োজন-
- কাউন্সেলিং-এর কক্ষ যাতে নিরিবিলি হয় এবং আলো বাতাস প্রবেশ করতে পারে সেদিক লক্ষ্য রাখতে হবে। নিরিবিলি পরিবেশ হলে আলোচনায় মনোযোগ থাকে, গোপনীয়তা বজায় রাখা যায়।
- কাউন্সেলিং-এর সময় কারণে বা অকারণে কোনো লোকজনের প্রবেশ বা যাতায়াত করা ঠিক নয়। এতে মনোযোগ বিচ্ছিন্ন হয়, আলোচনার ধারাবাহিকতা থাকে না।
- সময় কম বলে খুব তাড়াতাড়ি করা উচিত নয় এবং সেবা গ্রহীতাকে তাগাদা দেওয়া যাবে না।

- কাউন্সেলিং কক্ষে বিষয়বস্তু সম্পর্কিত পোস্টার, ফেস্টুন টাঙিয়ে রাখা এবং কাউন্সেলিং-এর সময় তা প্রদর্শন করে আলোচনার একঘেয়েমি দূর করা। কাউন্সেলিং-এর সময় সৌহার্দ্যপুর্ণ পরিবেশ বজায় রাখা।
- কাউন্সেলিং-এর সময় কাউন্সেলরের পোশাক অবশ্যই মানানসই, সাধারণ ও স্বাচ্ছন্দপূর্ণ হতে হবে। দামি পোশাক, দামি ঘড়ি, দামি অলংকার, চাকচিক্যপূর্ণ পোশাক ও দ্রব্য ব্যবহার করা সমীচীন নয়। এগুলোর কারণে ক্লায়েন্ট অমনোযোগী ও হতাশ হয়ে পড়তে পারে।

কাউন্সেলর-এর দক্ষতা

একজন কাউন্সেলরের দক্ষতার উপর কাউন্সেলিং-এর সফলতা অনেকটাই নির্ভর করে। একজন দক্ষ কাউন্সেলর দুইভাবে গ্রহীতার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন

১. **অবাচনিক যোগাযোগ (Non-verbal communication)**
২. **বাচনিক যোগাযোগ (Verbal communication)**

১. অবাচনিক যোগাযোগ (Non-verbal communication)

কথা না বলে যোগাযোগের সময় স্বাস্থ্যকর্মীদেরকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখতে হবে

- একই অবস্থানে বসা (Keep your head level)
- চোখে চোখ রাখা (Eye contact)
- কোনো বাধা না রাখা (Remove barrier)
- সময় নেওয়া (Taking time)
- সঠিকভাবে স্পর্শ করা (Appropriate Touch)

সেবাগ্রহীতার অনুভূতি বোঝা (Show that you understand how s/he feels)

একজন সেবাগ্রহীতা যখন তার কোনো প্রকার অনুভূতি ব্যক্ত করবে তখন আপনাকে অবশ্যই তার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে এবং তাকে বোঝাতে হবে যে আপনি তার অনুভূতি বুঝতে পেরেছেন। সহমর্মিতা এবং সহানুভূতি দুইটি ভিন্ন বিষয়। যখন আপনি কারো জন্য দুঃখ পেলেন তার মানে আপনি তাকে সহানুভূতি দেখাচ্ছেন, কিন্তু বিষয়টিকে আপনার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে অনুভব করতে হবে। একজন সেবাগ্রহীতার অনুভূতি বোঝার জন্য সহমর্মিতা অনেক বেশি কার্যকর। সহমর্মিতা দিয়ে সেবাগ্রহীতার ভালো ও খারাপ দুইটি অনুভূতিকেই সহজে অনুধাবন করা যায়।

২. বাচনিক যোগাযোগ (Verbal communication)

স্বাস্থ্যকর্মীদের যোগাযোগের সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখতে হবে।

- খোলা প্রশ্ন করা (Open Question)
- সেবাগ্রহীতার কথায় আগ্রহ প্রকাশ করা (Use response and show interest)
- সেবাগ্রহীতার কথার পুনরাবৃত্তি করা (Reflect back)
- সেবাগ্রহীতার অনুভূতি বুঝতে পারা (Show that you understand how she feels)
- বিচারমূলক শব্দ পরিহার করা (Avoid using judgmental words)

উন্মুক্ত প্রশ্ন করা (Ask Open Question):

খোলা প্রশ্ন সাধারণত খুবই উপকারী। প্রশ্নের উত্তরে সেবাগ্রহীতা অবশ্যই আপনাকে কিছু তথ্য দিবে। খোলা প্রশ্ন সাধারণত শুরু হয় 'কিভাবে, কখন, কোথায়, কেন' এইসব শব্দ দিয়ে। যেমন "কিভাবে আপনি শিশুকে খাওয়াচ্ছেন?"

- **আবদ্ধ প্রশ্ন (Close Question):** একটু কম উপকারী। সেবাগ্রহীতার কাছ থেকে যা আশা করা হয় সেবাগ্রহীতা তাই উত্তর দেয় এবং উত্তরটি 'হ্যাঁ' বা 'না' হয়। বদ্ধ প্রশ্ন সাধারণত শুরু হয়: 'আপনি কি খেয়েছেন?' 'আপনি কি আপনার শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ান?'
- **সহানুভূতি দেখানো (Using response and gestures which show interest):** একজন সেবাগ্রহীতার সাথে কথোপকথন চালিয়ে যাওয়ার জন্য আপনাকে বোঝাতে হবে যে আপনি তার কথা মনোযোগ সহকারে শুনছেন এবং কথা শোনার আগ্রহও আপনার আছে। আপনি যে

তার কথা আগ্রহ নিয়ে শুনছেন এটা বোঝানোর জন্য মাঝে মাঝে তার দিকে তাকান, মাথা নাড়ুন এবং হাসি দিন।

- **বিচারমূলক শব্দ পরিহার করা (Avoid using judgmental words):** কাউন্সেলিং এর সময় বিচারমূলক শব্দ পরিহার করলে আসল তথ্য পাওয়া যায়। এজন্য বিচারমূলক শব্দ পরিহার করা উচিত। বাংলা ভাষায় কিছু কিছু শব্দ বলা যেতে পারে যেমন; ভালো, মন্দ, ঠিক, ভুল, খারাপ, যথেষ্ট, যথাযথভাবে এগুলো বিচারমূলক শব্দ।

কাউন্সেলিং-এর অ্যাপ্রোচ

কাউন্সেলিং অধিবেশন দুইভাবে করা যায়:

- **একান্ত কাউন্সেলিং (Individual Counseling):** বাড়িতে বা ক্লিনিকে একজন সেবাগ্রহীতার সাথে কাউন্সেলিং করা হলে-তাকে একান্ত কাউন্সেলিং বলে।
- **দলীয় কাউন্সেলিং (Group Counseling):** বাড়িতে বা ক্লিনিকে মুখোমুখি কয়েকজন সেবাগ্রহীতার (ছোট দলে) সাথে কাউন্সেলিং করা হলে তাকে দলীয় কাউন্সেলিং (Group Counseling) বলে।

কাউন্সেলিং সফল করার জন্য নিচের প্রক্রিয়াগুলো বহুল পরিচিত ও মডেল হিসেবে অনুসরণ করা হয়:

GATHER অ্যাপ্রোচ

এই কাউন্সেলিং-এর ধাপসমূহ আলোচনা করার জন্য ইংরেজি শব্দ GATHER ব্যবহার করা যায়। পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে সেবা প্রদানের জন্য এই অ্যাপ্রোচ বেশি ব্যবহার করা হয়। **GATHER**-এর ৬টি ধাপ-

G	Greet clients (শুভেচ্ছা বিনিময় করা) যারা সেবা নিতে আগ্রহী তাদের শুভেচ্ছা জানানো এবং কুশলাদি জিজ্ঞাসা করা।
A	Ask and assess the need (চাহিদা নির্ণয় করা) - গ্রহীতা কী ধরনের সেবা চান বা 'আমি আপনার জন্য কী করতে পারি? এভাবে প্রশ্ন করে উত্তর জেনে তার চাহিদা নির্ণয় করা।
T	Tell about services (সেবা সম্পর্কে গ্রহীতাকে বলা) - সেবাকেন্দ্র বা সংস্থা যেসমস্ত সেবা দেয় সে সম্পর্কে গ্রহীতাকে বলা।
H	Help (সেবা বেছে নিতে গ্রহীতাকে সাহায্য করা) - যেসব সেবা দেওয়া হয় সেখান থেকে তার মানসিক ও আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করে চাহিদা অনুযায়ী সেবা বেছে নিতে সাহায্য করা।
E	Explain (বাছাইকৃত সেবা সম্পর্কে বিস্তারিত বলা) - যে সেবা গ্রহীতার পছন্দ হবে সে সম্পর্কে বিস্তারিত বলা।
R	Return to follow-up (পরবর্তী সেবা বা ফলো-আপের জন্য আসা) - পরবর্তীতে কেন আসা প্রয়োজন, কখন আসা প্রয়োজন, সঙ্গে কী নিয়ে আসবেন এইসব ভালোভাবে বলে দিতে হবে। পরবর্তী সাক্ষাতের দিন ও সময় ঠিক করে দিন।

REDI - অ্যাপ্রোচ

REDI কাউন্সেলিং সেবা প্রদানের আরেকটি অ্যাপ্রোচ বা প্রক্রিয়া যা সাধারণ কাউন্সেলিং-এ অনুসরণ করা হয়।

R	Rapport building (সুসম্পর্ক স্থাপন)
E	Exploration (চাহিদা নিরূপণ)
D	Decision making (সিদ্ধান্ত গ্রহণ)
I	Implementation the Decision

সেবাগ্রহীতার আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর ধাপসমূহ

পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণে ইচ্ছুক সেবাগ্রহীতার কাছে বিকল্প পদ্ধতিগুলো তুলে ধরুন, অবস্থার উন্নয়নে তারা নতুন নতুন চর্চাগুলো অনুশীলন করতে রাজি আছেন কি না জানতে চান এবং সেবাগ্রহণকারীকে বলুন কোনো একটি ব্যবস্থা বাছাই করতে যা তারা চেষ্টা করে দেখতে পারেন।

কীভাবে সেবাগ্রহীতার আত্মবিশ্বাস বাড়াতে হবে

- সেবাগ্রহীতার কথা গ্রহণ করা - সেবাগ্রহীতা যা বলছেন তা মনোযোগ দিয়ে শোনা। সেবাগ্রহীতার কথা বিশ্বাস করা এবং যা বলেছেন সে ব্যাপারে তার সাথে তর্ক বা উল্টা প্রশ্ন না করা বা কথার মাঝখানে থামিয়ে না দেওয়া;
- সেবাগ্রহীতার কাজের প্রশংসা করা এবং শিশুর সম্পর্কে ভালো কথা বলা;
- হাতে কলমে সাহায্য করা;
- সহজ ভাষা ব্যবহার করা অর্থাৎ যে ভাষায় আমরা কথা বলি সেভাবে সেবাগ্রহীতার সাথে কথা বলতে হবে;
- কঠিন ভাষা এবং সেবাগ্রহীতার বুঝতে অসুবিধা হয় এমন ভাষা ব্যবহার করা যাবে না।

যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার বিষয়ে কাউন্সেলিং-এর জন্য করণীয় কৌশল

যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে কাউন্সেলিং প্রদান সহজ কাজ নয়। কারণ যৌন জীবন, যৌন আচরণ মানুষের একান্ত নিজস্ব ও গোপনীয় বিষয়। এক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতার বয়স, লিঙ্গ, শিক্ষা, পেশা সামাজিক অবস্থান ও পদমর্যাদা অনুযায়ী কৌশল অবলম্বন করতে হবে। সেবাগ্রহীতার স্তরে যতটা সম্ভব তার মতো কথা বলতে হবে। নিম্নে উল্লিখিত বিষয়গুলো অনুসরণ করতে হবে-

- ব্যক্তির বিশ্বাস অর্জন করা
- ব্যক্তির কাছে গ্রহণযোগ্য এমন ভাষায় যৌন বিষয়ে কথা বলা
- সতর্কতা ও গোপনীয়তার সাথে সেবাগ্রহীতার যৌন আচরণ জেনে নেওয়া
- আবেগজনিত সমর্থন দেওয়া
- যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে জানা প্রত্যেকের অধিকার এই বিষয়টি সেবাগ্রহীতাকে বুঝিয়ে বলা ও উপলব্ধি করানো
- যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকারগুলো ব্যাখ্যা করা
- মানুষের যৌন আচরণ ভিন্ন হতে পারে তা ব্যাখ্যা করা
- সেবাগ্রহীতার যৌন আচরণের প্রতি সহনশীল ও ইতিবাচক থাকা
- সমস্যা চিহ্নিত করা (সেবাগ্রহীতা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মূল সমস্যা না বলতে পারে)
- মাসিক, স্বপ্নদোষ, যৌনমিলন এগুলো মানুষের জীবনের স্বাভাবিক বিষয় তা বুঝিয়ে বলা
- প্রাসঙ্গিক হলে সমকামীতা, উভকামীতা, বিপরীতকামীতা এসব বিষয় বুঝিয়ে বলা
- যৌনবাহিত সংক্রমণ ও যৌনরোগ সম্পর্কে তথ্য দেওয়া
- এইচআইভি ও এইডস সম্পর্কে ধারণা দেওয়া
- গর্ভধারণ ও অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভরোধ বিষয়ে তথ্য দেওয়া
- স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা কোথায় পাওয়া যায় তা জানানো

অধ্যায়-৩

মাসিক (ঋতুচক্র) স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা

মাসিক (ঋতুচক্র) স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা

মাসিক বা ঋতুচক্র (Menstrual Cycle)

মাসিক বা ঋতুচক্র নারীদের একটি স্বাভাবিক শারীরিক প্রক্রিয়া। বয়ঃসন্ধিকাল থেকে মাসিক শুরু হয়। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একজন নারীর শরীর গর্ভধারণ বা জন্মদানের জন্য প্রস্তুত হয়। একটি নির্দিষ্ট নিয়মে জরায়ুর ভিতরের আবরণের বাইরের স্তরটি হরমোনের প্রভাবে প্রতিমাসে ঝরে পড়াকে মাসিক বলা হয়। যে কয়েকদিন রক্তস্রাব হতে থাকে সেই কয়দিন মাসিকের কাল বলা হয়। স্বাভাবিক নিয়মে প্রতিমাসে ৩-৭ দিন রক্তস্রাব হয়। অধিকাংশ নারীদের সাধারণত ৫দিন পর্যন্ত রক্তস্রাব হয়ে থাকে। সাধারণত একজন নারীর মাসিক ১১ থেকে ১৪ বছর বয়সে শুরু হয়। এক মাসিকের শুরু থেকে পরের মাসিকের শুরু পর্যন্ত সময় মাসিক বা ঋতুচক্র হিসেবে পরিচিত। মাসিক/ঋতুচক্রের ব্যাপ্তি সাধারণত ২৮ দিন হয়। তবে এটি ২১ থেকে ৩৫ দিন পর্যন্তও হতে পারে।

মাসিক একটি স্বাভাবিক শারীরিক প্রক্রিয়া

- মাসিক মেয়েদের একটি স্বাভাবিক শারীরিক প্রক্রিয়া এবং এ নিয়ে ভয়, ঘৃণা, লজ্জা কিংবা মন খারাপের কিছু নেই। মাসিক চলাকালীন তলপেট, কোমর, পিঠ অথবা যোনীপথে ব্যথা হতে পারে;
- মাসিকের আগে অথবা মাসিক চলার সময় স্তনে সামান্য ব্যথা, দূর্বল লাগা, বমি-বমি ভাব, ক্লান্তিবোধ হতে পারে এবং কাজে অনীহা আসতে পারে।

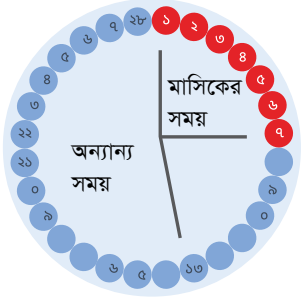

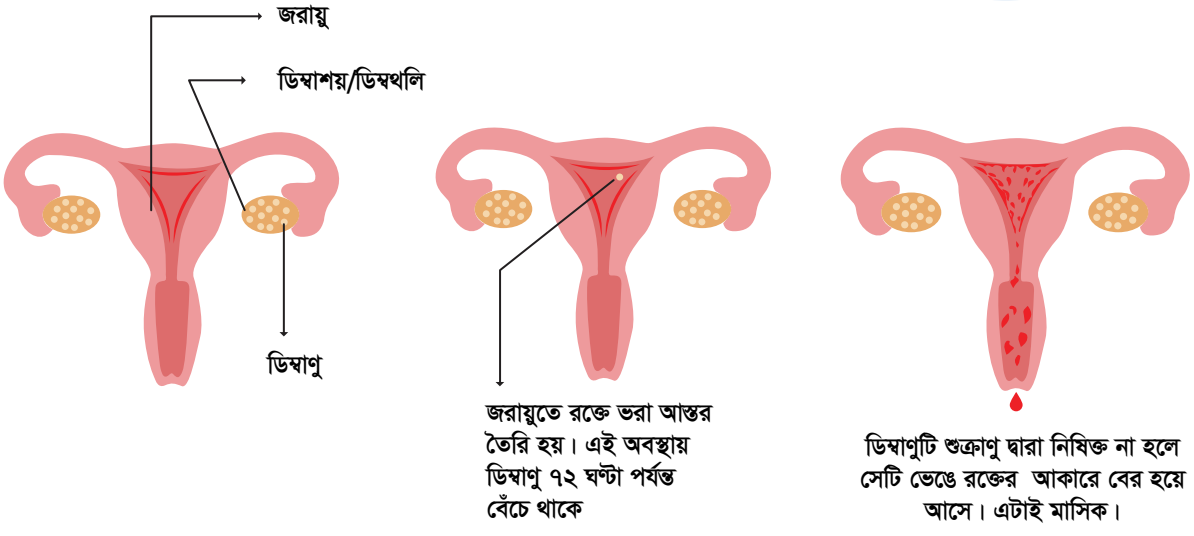

মাসিকের সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা

- প্রতিদিন গোসল করতে হবে, যোনীপথ ও এর চারপাশ নিরাপদ পানি ব্যবহার করে নিয়মিত পরিষ্কার রাখতে হবে;
- মাসিকের কাপড় বা প্যাড ভিজে গেলে প্রতি চার থেকে ছয় ঘণ্টা পর পর বদলাতে হবে;
- কখনোই ভেজা বা অপরিষ্কার কাপড় বা প্যাড ব্যবহার করা যাবে না;
- ব্যবহার করা কাপড় বা প্যাড বদলানোর পর ভালো করে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নিতে হবে;
- কাপড় রোদে শুকিয়ে, শুকনো ও পরিষ্কার স্থানে রাখলে পরবর্তী মাসিকের সময় তা ব্যবহার করা যায়।

চিত্র: নিয়ম করে ৪-৬ ঘণ্টা পর পর প্যাড বা কাপড় পরিবর্তন করা

চিত্র: প্রতিদিন গোসল করতে হবে

চিত্র: অপরিষ্কার কাপড় বা প্যাড ব্যবহার করা যাবে না

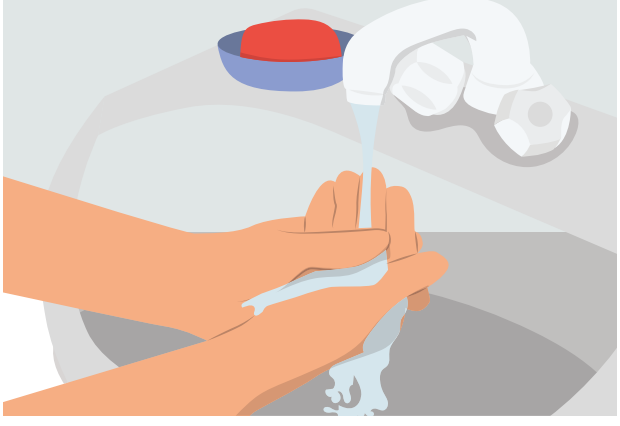

চিত্র: হাত ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে

চিত্র: কাপড় রোদে শুকিয়ে শুকনো ও পরিষ্কার স্থানে রাখতে হবে

মাসিকের সময় খাদ্য ও পুষ্টি

মাসিকের সময় মেয়েদের শরীর থেকে প্রচুর রক্ত বেরিয়ে যায়। এর ফলে শরীরে যে ঘাটতি সৃষ্টি হয় তা পূরণের জন্য বেশি করে আয়রন ও ক্যালসিয়ামযুক্ত পুষ্টিকর খাবার ও শাক-সবজি এবং ভিটামিন 'সি' সমৃদ্ধ টক ও লেবু জাতীয় ফল খেতে হবে।

- সবুজ শাক-সবজি কচুশাক, লাউশাক, পাটশাক, লালশাক, সিমের বিচি, বাদাম, ডাল, কলা ইত্যাদি পুষ্টিকর খাবারে আয়রন বেশি থাকে যা বেশি বেশি খাওয়া দরকার;
- গুড়, ডিম, কলিজা, শুটকি মাছ, দুধ, দই, ছোট মাছ, মুরগির মাংস ইত্যাদি খাবারে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম থাকে, যা বেশি বেশি খেতে হবে;
- এসময় প্রচুর পানি পান করা প্রয়োজন।

মাসিক সম্পর্কে কিছু ভ্রান্ত ধারণা

- মাসিক একটি লজ্জাকর ব্যাপার মনে করে মা'সহ পরিবারের অন্যান্য বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য এসব নিয়ে মেয়েদের সাথে আলোচনা করতে বিব্রতবোধ করেন ও লজ্জা পান;
- মাসিকের সময় দুধ, ডিম, কলা, মাছ, মাংস অথবা অন্য কোনো পুষ্টিকর খাবার খেতে পারবে না;
- ঘরের বাইরে যেতে পারবে না;
- কোনো সামাজিক অনুষ্ঠান ও উৎসব-পার্বণে অংশ নিতে পারবে না;
- খেলাধুলা করতে পারবে না।

উপরোক্ত ধারণাগুলো ঠিক নয়। বরং মাসিকের সময় মেয়েদের শরীরে যে ঘাটতি সৃষ্টি হয়, তা পূরণের জন্য বরং বেশি করে শাক-সবজি ও পুষ্টিকর খাবার খাওয়া প্রয়োজন। মাসিকের সময় স্বাভাবিক কাজকর্ম এবং ঘরের বাইরে খেলাধূলা করতে পারবে। কোনো সামাজিক অনুষ্ঠান ও উৎসব-পার্বণে অংশ নিতে বাধা নেই। এতে কোনো শারীরিক সমস্যাও হবে না।

চিত্র: ঘরের বাইরে যেতে পারবে

চিত্র: মাসিকের সময় পুষ্টিকর খাবার খেতে পারবে

চিত্র: খেলাধুলা করতে পারবে

চিত্র: খেলাধুলা করতে পারবে

মাসিকের সময় করণীয়

- মাসিকের বয়সের কাছাকাছি আসতেই কিশোরীদের এ বিষয়ে সঠিক ধারণা ও জ্ঞান দেওয়া প্রয়োজন।
- মাসিকের সময় ভালো স্যানিটারি প্যাড/ন্যাপকিন অথবা পরিষ্কার সুতি কাপড় যা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ হয় সেটি ব্যবহার করতে হবে;
- মাসিকের কাপড় সাবান ও নিরাপদ পানি দিয়ে ধুতে হবে, কারণ মাসিকের সময় ব্যবহৃত কাপড় অপরিষ্কার থাকলে অনেক ধরনের সংক্রমণ হতে পারে;
- ধোয়ার পর এসব কাপড় খোলামেলা ও যথেষ্ট রোদ আসে এমন স্থানে শুকাতে হবে। অনেকে ঘরের অন্ধকার কোণে স্যাঁতস্যাঁতে জায়গায় এসব কাপড় শুকায়, যা কখনো উচিত নয়;
- কাপড় শুকানোর পর পরিষ্কার কোনো প্যাকেটে ভরে পরিষ্কার স্থানে রাখতে হবে;
- মাসিকের সময় স্যানিটারি প্যাড/ন্যাপকিন ব্যবহার সবচেয়ে নিরাপদ এবং ব্যবহারের পর এটি অবশ্যই ভালো করে মুড়িয়ে ময়লার ঝুড়িতে ফেলতে হবে যাতে জীবাণু ছড়াতে না পারে;
- একই মাসে মাসিকের পর পুনরায় রক্তপাত হলে কিংবা রক্তপাত সাতদিনের বেশি থাকলে

চিত্র: মাসিকের সময় ভালো স্যানিটারি প্যাড, সুতি কাপড় ব্যবহার করতে হবে

চিত্র: মাসিকের কাপড় সাবান ও পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুতে হবে

চিত্র: কাপড় খোলামেলা ও যথেষ্ঠ রোদ আসে এমন স্থানে শুকাতে হবে

চিত্র: প্যাকেটে ভরে পরিষ্কার স্থানে রাখতে হবে

চিত্র: প্যাড ভালো করে মুড়িয়ে ময়লার বাক্সে ফেলতে হবে

চিত্র: ডাক্তার এর পরামর্শ নিতে হবে

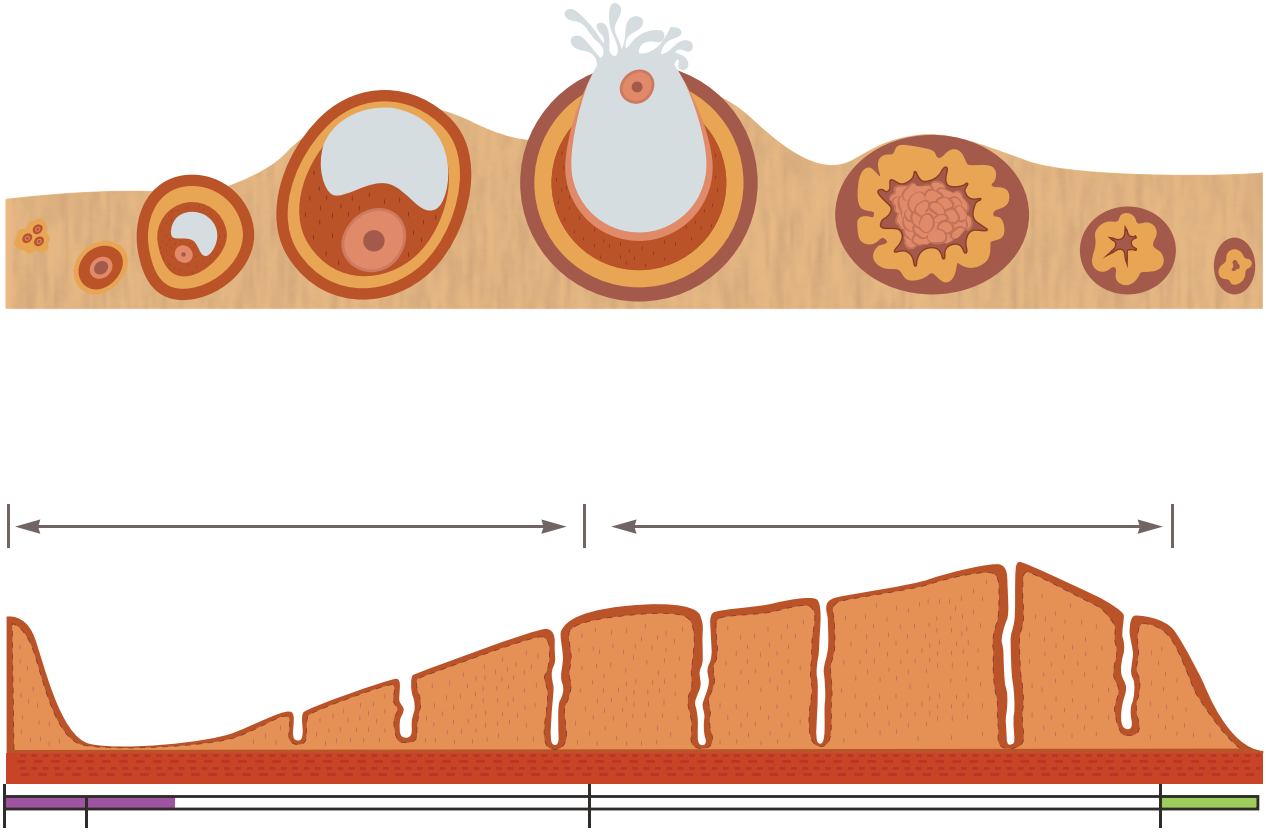

চিত্র: মাসিক/ ঋতুচক্র

অনিয়মিত মাসিক

মাসিকের সময় নিম্নবর্ণিত জটিলতা হলে সেটাকে অনিয়মিত মাসিক বলে। এতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। তবে এই ধরনের জটিলতায় চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া দরকার।

অনিয়মিত মাসিকের লক্ষণ:

- অতিরিক্ত রক্তস্রাব যাওয়া;
- সাতদিনের বেশি রক্তস্রাব চলা;
- মাসে একবারের বেশি মাসিক হওয়া;
- কালো জমাট রক্ত পড়া, ফোটা ফোটা রক্ত পড়া
- তীব্র ব্যথা অনুভূত হওয়া;
- মাসিকের আগে বা পরে দুর্গন্ধযুক্ত সাদা স্রাব হওয়া;
- সাদা স্রাবের সঙ্গে চুলকানি থাকা;
- গায়ে জ্বর থাকা।

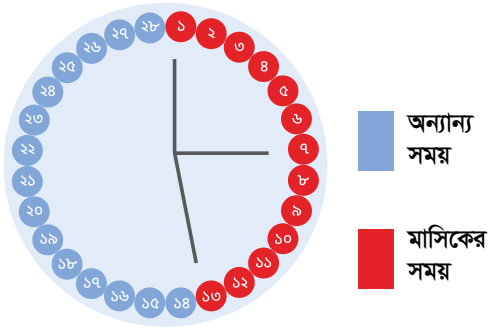

চিত্র: সাত দিনের বেশি রক্তস্রাব চলা

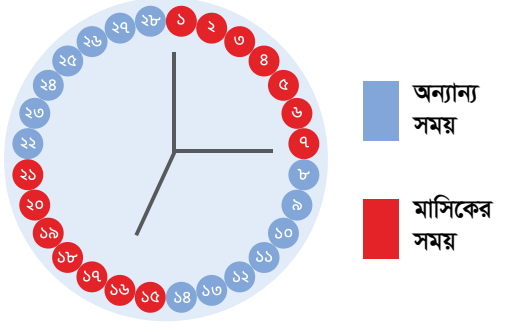

চিত্র: মাসে একবারের বেশি রক্তস্রাব হওয়া

অনিয়মিত মাসিকের কিছু কারণ

- ওজন কমে যাওয়া বা অতিরিক্ত ওজন বেড়ে যাওয়া
- অপুষ্টি
- কোনো সংক্রমণ বা অসুস্থতা
- ধূমপান
- ড্রাগ বা অতিরিক্ত অ্যালকোহল (মদ) পান
- হরমোন সংক্রান্ত অসামঞ্জস্যতা/জটিলতা
- ক্ষুধামন্দা
- কোনো ধরনের মানসিক চাপ

চিত্র: সাদা স্রাব সঙ্গে চুলকানি থাকা

চিত্র: গায়ে জ্বর থাকা

অধ্যায়-৪

কৈশোরে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং বাল্যবিবাহ

কৈশোরে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং বাল্যবিবাহ

কৈশোর

কৈশোর (Adolescence) হলো শৈশব থেকে যৌবন-এ পদার্পণ করার মধ্যবর্তী অবস্থা। এসময় জুড়ে বিভিন্ন রকম শারীরিক পরিবর্তন ঘটে এবং আকস্মিক হরমোনের পরিবর্তনের কারণে মানসিক আবেগের তীব্রতার উত্থান-পতন ঘটে, যা বয়ঃসন্ধি নামে পরিচিত। বয়ঃসন্ধিকাল হলো যৌবনের উন্মেষ ও বিকাশের সময়। কৈশোর হতে যৌবন প্রাপ্তি পর্যন্ত সময়কে কৈশোর বা বয়ঃসন্ধিকাল বলা হয়। সাধারণত ১০ থেকে ১৯ বছর বয়স পর্যন্ত সময় হলো কৈশোর। এই বয়সের ছেলে ও মেয়েদের কিশোর-কিশোরী বলা হয়।

কৈশোরের সার্বজনীন সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যাদের বয়স ১০ থেকে ১৯ এর মধ্যে তারাই হলো কিশোর-কিশোরী। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) কৈশোরকালকে ৩টি ভাগে ভাগ করেছে। যেমন- প্রাক কৈশোর ১০-১৪ বছর, মধ্য কৈশোর ১৫-১৭ বছর এবং ১৮-১৯ পূর্ণ কৈশোর।

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-পঞ্চমাংশের অধিক ১০-১৯ বছর বয়সী অর্থাৎ কিশোর-কিশোরী। এই কিশোর-কিশোরীদের শিক্ষা, জীবন-দক্ষতা ও স্বাস্থ্যের উপর নির্ভর করছে আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ।

বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তন ও বিকাশ

বয়ঃসন্ধিকালে কিশোর-কিশোরীদের শরীরে দৃশ্যমান ও অদৃশ্য অনেক পরিবর্তন ঘটে।

বয়ঃসন্ধিকালে যেসব পরিবর্তন ঘটে সেগুলো প্রধানত তিন ধরনের-

১. শারীরিক

২. মানসিক ও আবেগজনিত

৩. আচরণগত

১. কৈশোর বা বয়ঃসন্ধিকালীন শারীরিক পরিবর্তন ও বিকাশ

কিশোরদের শারীরিক পরিবর্তন	• দ্রুত লম্বা হয়ে ওঠে; • দ্রুত ওজন বাড়ে ও শরীরে দৃঢ়তা আসে; • শরীরের গঠন প্রাপ্তবয়স্কদের মতো হতে থাকে; • দাড়ি, গোঁফ গজায়, হাতে পায়ের লোম গাঢ় হয়, বুকে লোম গজায়; • বুক ও কাঁধ চওড়া হয়; • কণ্ঠস্বর পরিবর্তন হয়; • গোপনাঙ্গে লোম গজায়; • বীর্যপাত হয়।
কিশোরীদের শারীরিক পরিবর্তন	• উচ্চতা ও ওজন বাড়ে; • কোমর সরু হয়, উরু ও নিতম্ব ভারি হয়; • চামড়া তৈলাক্ত হয়; • স্তন বড় হয়; • শারীরিক গড়ন বৃদ্ধি পায়; • গোপনাঙ্গে লোম গজায়; • ঋতুস্রাব বা মাসিক শুরু হয়।

চিত্র: কিশোরীদের শারীরিক পরিবর্তন

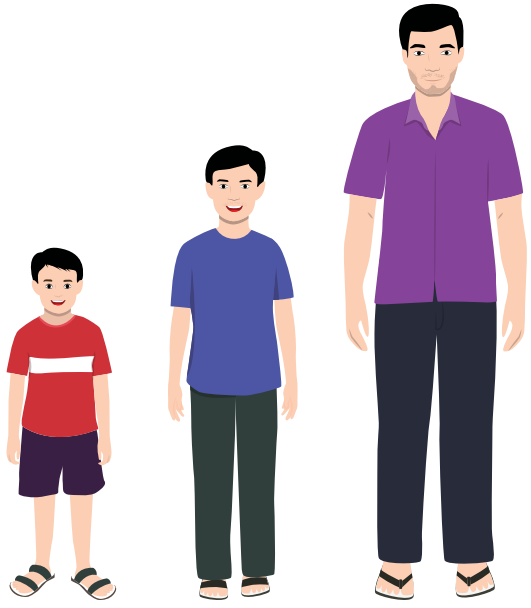

চিত্র: কিশোরদের শারীরিক পরিবর্তন

২. মানসিক ও আবেগজনিত পরিবর্তন

কৈশোরে বিকাশের সময় শারীরিক, মানসিক ও আচরণগত এবং আবেগীয় পরিবর্তন অতিমাত্রায় লক্ষ্য করা যায়। এসময় যে পরিবর্তনগুলো সাধারণত হয় সেগুলো হলো দ্রুত শারীরিক বৃদ্ধি, বিভিন্ন বিষয়ে ধারণা লাভ, মানসিক অবস্থার দোদুল্যমানতা, পরিবারে নিজেকে মানাতে না পারা, বন্ধুদের প্রতি আকর্ষণ বেড়ে যাওয়া এবং যৌনজীবন সম্পর্কে কৌতূহল। কিশোর-কিশোরীর মানসিক বিকাশের বহিঃপ্রকাশ ঘটে বাহ্যিক আচরণিক প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেমন: হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, বিষণ্নতা, মানসিক চাপ ও ক্রোধ প্রভৃতি। এগুলো সবই হলো তার আবেগীয় সত্তার বহিঃপ্রকাশ।

আবেগ হলো এক ধরনের শরীরবৃত্তীয় মানসিক অবস্থা যে অবস্থায় যুক্তির চেয়ে ভাবনা বেশি প্রাধান্য পায়। অতিরিক্ত আবেগ কখনোই ভালো না। অতিরিক্ত আবেগ থেকে এক ধরনের মানসিক চাপ সৃষ্টি হয়। মানসিক চাপ কখনো কখনো সামাজিক অবস্থার সাথে সমন্বয় সাধনে ব্যর্থ হয়। কিশোর-কিশোরীর আবেগীয় বিকাশ ঘটে কতগুলো সুনির্দিষ্ট পরস্পর নির্ভর উপাদানের মিথষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে।

এক্ষেত্রে জিন বা বংশগতি একটি বড় উপাদান। কারণ মা-বাবা বা পূর্বপুরুষের জিন এক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে। যেমন: কিশোর-কিশোরী অতিমাত্রায় সংবেদনশীল, কঠোর, দৃঢ় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বা দুর্বল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হবে তা নির্ভর করে বংশগতির উপর। অনেক সময় এটি বংশ পরম্পরায় সঞ্চারিত হয়। এসময় নিম্নোক্ত পরিবর্তনগুলো দেখা যায়-

- অজানা বিষয়ে জানার কৌতূহল বাড়ে;
- শারীরিক পরিবর্তনের ফলে চলাফেরায় দ্বিধা, দ্বন্দ্ব ও লজ্জা কাজ করে;
- নিকটজনের মনোযোগ, আদর যত্ন ও ভালোবাসা পাবার আকাঙ্ক্ষা তীব্র হয়;
- আবেগ দ্বারা চালিত হবার প্রবণতা বাড়ে ও কল্পনাপ্রবণ হয়;
- ছেলেমেয়েদের পরস্পরের প্রতি কৌতূহল সৃষ্টি হয়;
- মানসিক পরিপক্কতার পর্যায় শুরু হয়;
- স্বাধীনভাবে চলতে ইচ্ছা করে;
- কিশোর-কিশোরীরা এ অবস্থায় নানা ধরনের ভুল করে, ফলে আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়। এমনকি মৃত্যু বা আত্মহত্যার মতো ঘটনা ঘটতে পারে।

৩. আচরণগত পরিবর্তন

- প্রাপ্ত বয়স্কদের মতো আচরণ করে;
- নিজেদের মতামত প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে;
- আবেগের দ্রুত পরিবর্তন দেখা দেয়। যেমন-কখনো মন চঞ্চল হয় আবার কখনো বা বিষণ্ন হয়। নানা ধরনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও অস্থিরতা কাজ করে;
- দুঃসাহসিক ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজের প্রতি আগ্রহ বাড়ে;
- সৌন্দর্য সচেতনতা বাড়ে;
- বন্ধুদের সঙ্গ পছন্দ করে।

বয়ঃসন্ধিকালে আকস্মিক শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন কিশোর-কিশোরীদের মনে নানা প্রশ্নের জন্ম দেয়। এসময় তাদের বেড়ে ওঠা ও প্রজনন স্বাস্থ্য নিয়ে অনেক তথ্যের প্রয়োজন হয়।

বয়ঃসন্ধিকাল ও কৈশোরের ঝুঁকি

- বন্ধু-বান্ধবদের চাপে পড়ে তারা বিপদজনক কাজে জড়িয়ে পড়তে পারে;
- কৌতুহলের বশে বা কোনো অসৎ সঙ্গে পড়ে ধূমপান, মাদকাসক্তি, অনিরাপদ যৌন-আচরণসহ নানা ধরনের অসামাজিক কাজে লিপ্ত হতে পারে;
- প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে সঠিক জ্ঞান না থাকার কারণে প্রজননতন্ত্রে নানা ধরণের রোগ সংক্রমণ এবং অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণের ঝুঁকি বেড়ে যেতে পারে;
- আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যু বা আত্মহত্যার মতো ঘটনা পর্যন্ত ঘটতে পারে।

চিত্র: দুর্বলকে উত্যক্ত করা

চিত্র: কৌতুহলের বশে বা কোনো অসৎ সঙ্গে পড়ে ধূমপান, মাদকাসক্তি

কিশোর-কিশোরীদের পুষ্টি

বাংলাদেশে কিশোর-কিশোরীদের পুষ্টিমান সন্তোষজনক নয়। তাদের মধ্যে পুষ্টিজ্ঞানের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। স্বাস্থ্যকর খাবার যেমন: মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, শাক-সবজি, ডাল এবং গর্ভকালীন সময়ে ও স্তন্যদানকালে ফলমূল গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তারা সাধারণত অসচেতন হয়ে থাকে। কিশোরী মেয়েদের একটি বিরাট অংশ অপুষ্টিতে ভোগে। বিডিএইচএস-২০১৪-এর তথ্য অনুযায়ী ১৫-১৯ বছর বয়সী বিবাহিত মেয়েদের ১৯% কম ওজনের (বিএমআই< ১৮.৫) এবং ১৩% খর্বকায় (উচ্চতা < ১৪৫সে:মি:)।

চিত্র: কিশোর-কিশোরীদের পুষ্টি

কৈশোরে খাদ্য ও পুষ্টি

- শারীরিক বৃদ্ধির জন্য আমিষ জাতীয় খাবার (মাছ, মাংশ, ডিম, দুধ, ডাল, সয়াবিন ইত্যাদি) ও প্রচুর আয়রন (কচুশাক, লাউশাক, পাটশাক, লালশাক, গুড়, ডিম, শুটকিমাছ, কলিজা ইত্যাদি) এবং ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ (গুড়, ডিম, দুধ, শুটকিমাছ, কাঁটাসহ ছোট মাছ ইত্যাদি) খাবারের প্রয়োজন;
- গাঢ় সবুজ শাক-সবজি, হলুদ ফলমূল যেমন মিষ্টি কুমড়া, গাজর, পাকা পেঁপে, পাকা আম, কাঁঠাল ইত্যাদি যাতে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন "এ" থাকে;
- টক জাতীয় ফল যেমন আমড়া, আমলকি, লেবু ইত্যাদি যাতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন "সি" থাকে;
- বড় মাছের তেলে, দুধ ও দুধ থেকে তৈরি খাবার এবং সূর্যের আলো যাতে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন "ডি" থাকে।

কিশোর-কিশোরীদের রক্তস্বল্পতা

কিশোর-কিশোরীদের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ (৩০%) রক্তস্বল্পতায় ভোগে। রক্তস্বল্পতার কারণে সংক্রমণের বিরুদ্ধে শারীরিক প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকে, কম কর্মক্ষমতা ও অসম শিখণ দেখা যায়। কিশোরীদের দ্রুত বৃদ্ধি, মাসিকে রক্তস্রাব ও প্রজননের কারণে প্রচুর আয়রনের প্রয়োজন হয় এবং তাদের রক্তস্বল্পতা শিশুর জন্মকালে জটিলতা ও জন্মকালীন কম ওজন এবং মা ও নবজাতকের মৃত্যুর ঝুঁকি বেড়ে যায়।

কৈশোরে বিয়ে, গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসব

বাংলাদেশে বিবাহের আইনগত বয়স মেয়েদের ১৮ বছর ও ছেলেদের ২১ বছর হলেও অধিকাংশ কিশোরীর ১৮ বছর বয়সের আগেই বিয়ে হয়ে যায়। বিডিএইচএস-২০১৭ অনুযায়ী বাংলাদেশে ২০-২৪ বছর বয়সী নারীদের শতকরা ৫৯% ১৮ বছর বয়সের আগেই বিয়ে হয়ে যায় যা বিশ্বে চতুর্থ অবস্থানে আছে।

১৫-১৯ বছর বয়সী কিশোরীদের প্রতি ১০০০ জনে গর্ভধারণের হার ১১৩ জন (Adolescent Fertility Rate)। বাল্যবিবাহ, কৈশোরকালীন মাতৃত্ব, কিশোরী মায়ের গর্ভে শিশুর বৃদ্ধি ব্যাহত হওয়ার ঝুঁকি, মৃতসন্তান প্রসব, অপরিপক্ক প্রসব, জন্মকালীন কম ওজনের শিশু, প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ ইত্যাদি কারণে কিশোরী মেয়েরা স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে থাকে। পরিণামে তাদের ভগ্নস্বাস্থ্য থেকে শুরু করে সন্তান প্রসবকালে বা প্রসব পরবর্তী মৃত্যুও হয়ে থাকে। এছাড়া স্থুল পেলভিস, ভেসিকো-ভ্যাজাইনাল ফিস্টুলা, প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ ইত্যাদির কারণে বাধাগ্রস্ত প্রসব হয়ে থাকে এবং কিশোরীরা জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে।

চিত্র: বাল্য বিবাহ

কিশোর-কিশোরীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার

বাংলাদেশে তিন কোটি ষাট লক্ষ কিশোর-কিশোরী রয়েছে, যারা এদেশের মোট জনসংখ্যার ২২ শতাংশ। তারপরেও তাদের উপযোগী করে সেবার ব্যবস্থা ততটা গুরুত্ব পায়নি। এবিষয়ে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা দিন দিন বাড়ছে। বাল্যবিবাহের উচ্চহারের কারণে বাংলাদেশে বয়ঃসন্ধিকালেই অনেক মেয়ে গর্ভধারণ, সহিংসতা ও অপুষ্টির ঝুঁকিতে থাকে। (তথ্যসূত্র: ইউনিসেফ বাংলাদেশ)

এই অবস্থার কারণে বাংলাদেশে অনেক নবজাতকের মৃত্যু হয়। বাংলাদেশে বয়ঃসন্ধিকালের প্রতি তিনজন মেয়ের মধ্যে একজনই রুগ্ন। তাদের অধিকাংশেরই জিংক, আয়োডিন ও আয়রনের ঘাটতি রয়েছে। বাংলাদেশের কিশোর-কিশোরীরাও যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার থেকে অনেকটা বঞ্চিত। তাই কিশোর-কিশোরীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার বিষয়ে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

চিত্র: আল্প বয়সে গর্ভধারণ

কিশোর-কিশোরীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে তথ্য

কিশোর-কিশোরীদেরও মধ্যে তাদের শরীর, যৌনতা, জন্মনিয়েন্ত্রণ বিষয়ে কোথায় তথ্য পাওয়া যাবে, অপরিকল্পিত গর্ভধারণ থেকে কীভাবে নিজেদেরকে সুরক্ষা করতে হবে এবং এইচআইভি/এইডস সহ যৌনবাহিত রোগের বিষয়ে তথ্যের অভাব রয়েছে। অযাচিত এবং অনিরাপদ যৌন সংশ্রব থেকে তাদের কীভাবে সুরক্ষা করতে হবে সেবিষয়ে তাদের উন্নততর দক্ষতার ঘাটতি রয়েছে। তথ্য, জ্ঞান এবং সেবা নিরাপদ যৌন আচরণ গ্রহণ নিশ্চিত করতে পারে।

পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির ব্যবহার

বাংলাদেশে ১৫-১৯ বছর বয়সী কিশোরীদের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার বিডিএইচএস- ২০১৭-এর তথ্য অনুযায়ী জানা যায়, বর্তমানে বিবাহিত ১৫-১৯ বছর বয়সী কিশোরীদের মধ্যে প্রায় ৪৮.৯% আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহার করেছে।

বয়ঃসন্ধিকালীন গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি শারীরিক ও মানসিক সমস্যা

- অপুষ্টি বিশেষ করে আয়রন এবং আয়োডিনজনিত ঘাটতি;
- অল্প বয়সে বিয়ে এবং অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণ;
- মাসিকজনিত সমস্যা;
- কম বয়সে ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভধারণজনিত কারণে মাতৃমৃত্যু;
- গর্ভপাতজনিত জটিলতা;
- প্রতিরোধহীন যৌন আচরণের কারণে প্রজনন তন্ত্রের সংক্রমণ (RTI) এবং যৌনবাহিত সংক্রমণ (STI);
- মাদকাসক্তি;
- আত্মহত্যার প্রবণতা, সহিংসতা এবং যৌন নিপীড়নের শিকার হওয়া;
- সাধারণ সংক্রামক নয় এমন রোগে আক্রান্ত হওয়া;
- ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সম্পর্কে তথ্য, শিক্ষা ও সেবার অভাব।

কৈশোরে প্রজনন স্বাস্থ্য রক্ষায় করণীয়

- পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা;
- মাসিকের স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থাপনা;
- কিশোরীদের রক্তস্বল্পতার জন্য সপ্তাহে ২টি করে আয়রন বড়ি খেতে হবে;
- নিরাপদ যৌন আচরণ সম্পর্কে জানা ও তা মেনে চলা;
- প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ, যৌনরোগ সম্পর্কে জানা ও প্রতিরোধ করা;
- প্রয়োজন অনুযায়ী প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করা;
- বাল্যবিবাহ পরিহার করা;
- বাল্যবিবাহ হয়ে গেলে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার করা;
- পুষ্টিকর খাবার ও প্রচুর পানি পান করা;
- প্রজনন অঙ্গ রোগাক্রান্ত হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া;
- ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসন মেনে চলা;
- পড়াশোনা, খেলাধূলা, সাংস্কৃতিক চর্চাসহ অন্যান্য সৃজনশীল কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখা;
- অশ্লীল বইপত্র এবং ভিডিও বা সিনেমা দেখা থেকে বিরত থাকা;
- যৌন নির্যাতনের শিকার হলে অবশ্যই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মা-বাবা, শিক্ষক বা বিশ্বস্ত কোনো মানুষকে বিষয়টি জানানো।

কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্যসেবা

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর পর্যায়ক্রমে দেশের জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের সেবাকেন্দ্রগুলোতে কৈশোর বান্ধব স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। একই সেবাকেন্দ্র থেকে কিশোর-কিশোরীদের প্রয়োজনীয় সব ধরনের তথ্য ও সেবা দেওয়াই কৈশোর বান্ধব স্বাস্থ্যসেবার উদ্দেশ্য।

কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির স্থান

১. মাতৃসদন ও শিশুস্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (MCHTI) এবং মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, আজিমপুর;
২. মোহাম্মদপুর ফার্টিলিটি সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার (MFSTC);
৩. লালকুটি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, মিরপুর-১;
৪. মাতৃসদন ও শিশুস্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (MCHTI) এবং শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান (ICMH), মাতুয়াইল;
৫. জেলা সদর হাসপাতাল;
৬. মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রসমূহ;
৭. উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স- মা, শিশু ও পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক;
৮. ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র/আরডি;
৯. কমিউনিটি ক্লিনিক;
১০. স্যাটেলাইট ক্লিনিক;
১১. সেবাগ্রহীতার বাড়ি (পরিবার কল্যাণ সহকারী কর্তৃক বাড়ি পরিদর্শনকালে);
১২. মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসমূহ (সরকারি এবং সরকার অনুমোদিত বেসরকারি মালিকাধীন);
১৩. অনুমোদিত এনজিও/বেসরকারি সংস্থার ক্লিনিক/ প্রাইভেট ক্লিনিক/ হাসপাতালসমূহ।

বাল্যবিবাহ

বাংলাদেশে ১৮ বছরের কম বয়সী মেয়ে ও ২১ বছরের কম বয়সী ছেলেদের সাথে বিবাহকে বাল্যবিবাহ বলে। পাত্র-পাত্রী যেকোনো একজনের বয়স নির্ধারিত বয়সের কম হলে বাল্যবিবাহ হিসেবে গণ্য হবে। বাংলাদেশে বাল্যবিবাহের হার অত্যন্ত বেশি। বিডিএইচএস, ২০১৭-এর তথ্য অনুযায়ী জানা যায়, বাংলাদেশে বিয়ের গড় বয়স ১৬.৩ বছর। এর ফলে কিশোর-কিশোরীরা দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে বিশেষত কিশোরীরা।

বাল্যবিবাহের কারণ

- সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা;
- দারিদ্রতা;
- যৌবনে পদার্পণ করার আগে মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার সামাজিক ও ধর্মীয় প্রবণতা;
- কিশোর-কিশোরীদের যৌনকর্মে লিপ্ত এবং স্বেচ্ছায় বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া;
- প্রথম মাসিক ঋতুস্রাবকে বিপদ সংকেত মনে করা;
- কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার দায়মুক্ত হওয়ার প্রবণতা;
- শিক্ষার অভাব ও আইন সম্পর্কে অজ্ঞতা;
- মেয়েদের লেখাপড়া ও উপার্জনের সুযোগ কম থাকা;
- মেয়ে শিশুর প্রতি অবহেলা;
- মেয়ে সন্তানকে বাড়তি বোঝা হিসেবে মনে করা;
- যৌন হয়রানি/বখাটেদের উৎপাতের কারণেও অভিভাবকগণ কম বয়সে মেয়ের বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চান।

বাল্যবিবাহের কুফল

- মানসিক ও শারীরিক বিকাশ পূর্ণতা না পাওয়ার ফলে অনেক মেয়েই স্বামী ও তার পরিবারের সাথে মানিয়ে চলতে পারে না;
- ২০ বছরের আগে মেয়েদের শরীর সন্তান গ্রহণের জন্য উপযুক্ত হয় না। মেয়েদের দেহের পূর্ণতা প্রাপ্তির আগেই যদি কেউ সন্তান ধারণ করে তাহলে তার দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয়;
- গর্ভজনিত জটিলতায় মাতৃমৃত্যুর প্রধান/মূল কারণ হলো বাল্যবিবাহ ও কিশোরী বয়সে গর্ভধারণ;
- অল্প বয়সে বিয়ে হলে কিশোরী মা সঠিকভাবে শিশু লালন পালন করতে পারে না;
- শারীরিক বিকাশ সম্পূর্ণ হয় না বলে গর্ভধারণ ও প্রসবে জটিলতা দেখা দিতে পারে;

- সন্তান প্রসবের সময় কিশোরী মা মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে থাকে। এঅবস্থায় মা ও সন্তান উভয়েরই মৃত্যু হতে পারে। যেমন- প্রসবের রাস্তা ছিঁড়ে যেতে পারে, প্রস্রাব ও পায়খানার রাস্তা এক হয়ে যেতে পারে, প্রসব পরবর্তী ফিস্টুলা হতে পারে। এধরনের জটিল রোগের কারণে স্বামী কর্তৃক তালাকপ্রাপ্ত হতে পারে;
- অল্প বয়সী মা নিজেই অপুষ্টিতে ভোগে যার কারণে নবজাত শিশুর জন্মকালীন ওজন কম থাকে। অপুষ্ট মায়ের পক্ষে শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানো অনেক সময় সম্ভব হয় না। ফলে শিশুটিও অপুষ্টিতে ভোগে।
- অল্প বয়সে বিয়ে দেওয়ার কারণে মেয়েটির লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়, ফলে স্বামীর বাড়িতে তাকে কেউ গুরুত্ব দিতে চায় না।

বাল্যবিবাহের আইন (বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭)

- বাল্যবিবাহ আইনত নিষেধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ। আইন অনুযায়ী ১৮ বছরের কম বয়সী মেয়ে ও ২১ বছরের কম বয়সী ছেলেকে নাবালক বলা হয়। শিশু বা নাবালকের বিয়ে আইনত নিষেধ। পাত্র-পাত্রীর যেকোনো একজন শিশু বা নাবালক হলে বাল্যবিবাহ হিসেবে গণ্য হবে। কোনো মেয়ের বয়স ১৮ বছর পূর্ণ হলে এবং ছেলের বয়স ২১ বছর পূর্ণ হলে প্রাপ্তবয়স্ক বলা হবে। বিবাহের পূর্বশর্ত প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া।
- ২১ বছর বয়সের কম কোনো পুরুষ ১৮ বছরের কম কোনো মেয়েকে বিয়ে করতে পারবে না। কোনো প্রাপ্তবয়স্ক নারী বা পুরুষ কোনো অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলে বা মেয়েকে বিয়ে করলে তা বাল্যবিবাহ। বাল্যবিবাহ আইনে বাল্যবিবাহ করেছেন এমন ব্যক্তিকে অনধিক দুই বছর কারাদণ্ড বা অনধিক এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন। অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরো অনধিক তিন মাস কারাদন্ডে দণ্ডিত হবেন।
- পিতা-মাতা, অভিভাবক বা অন্যকোনো ব্যক্তি আইনগতভাবে বা আইন বহির্ভূতভাবে অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির বিবাহ দিলে, বিবাহের অনুমতি দিলে বা নির্দেশ দিলে অথবা অবহেলা করে বিবাহ বন্ধ করতে ব্যর্থ হলে তিনি বা তারা অনূন্য (কমপক্ষে) ছয় মাস ও অনধিক দুই বছর কারাদণ্ড বা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন। যে বাবা-মা নাবালক ছেলে-মেয়েদের বিয়ে দেবেন তাদের ক্ষেত্রেও একই শাস্তি প্রযোজ্য হবে। তবে এই আইনে কোনো নারীকে কারাদণ্ড দেওয়া যাবে না, শুধুমাত্র জরিমানা করা যাবে। তাই মায়ের জরিমানা হলেও জেল হবে না।
- নাবালকের বিবাহ (বাল্যবিবাহ) যিনি বা যারা ব্যবস্থা ও পরিচালনা করবেন তিনি বা তারাও অপরাধী হিসেবে গণ্য হবেন। অপরাধী অনধিক দুই বছর ও অনূন্য ছয় মাস কারাদণ্ড বা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন। অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরো অনধিক তিন মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবেন।
- বাল্যবিবাহ নিবন্ধনকারীও (রেজিস্ট্রার/কাজী) অপরাধী হিসেবে গণ্য হবেন এবং অনধিক দুই বছর ও অনূন্য ছয় মাস কারাদণ্ড বা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন। অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরো অনধিক তিন মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবেন এবং তার লাইসেন্স বা নিয়োগ বাতিল হয়ে যাবে।
- কোথাও বাল্যবিবাহের আয়োজন হলে যে কেউ আদালতে অভিযোগ জানাতে পারেন। তবে অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হলে অনধিক ছয় মাস কারাদণ্ড বা অনধিক ত্রিশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন। অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরো অনধিক এক মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবেন।
- এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ সংঘটিত হলে দুই বছরের মধ্যে অভিযোগ দায়ের করা না হলে আদালত অভিযোগ গ্রহণ করবে না।

অধ্যায়-৫

নিরাপদ মাতৃত্ব ও জরুরি প্রসূতি সেবা এবং নবজাতকের অত্যাবশ্যকীয় সেবা

নিরাপদ মাতৃত্ব ও জরুরি প্রসূতি সেবা এবং নবজাতকের অত্যাবশ্যকীয় সেবা

নিরাপদ মাতৃত্ব (Safe motherhood)

নিরাপদ মাতৃত্ব হচ্ছে এমন একটি পরিবেশ যেখানে একজন নারী গর্ভবতী হবেন কি না সে বিষয়ে নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। এক্ষেত্রে যদি একজন নারী গর্ভবতী হন তাহলে তিনি সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় সেবা পাওয়ার অধিকার রাখেন। বাংলাদেশে মাতৃমৃত্যুর হার এখনও অনেক বেশি। Sample Vital Registration System 2019 (SVRS)-এর তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে মাতৃমৃত্যুর হার ১৬৫ জন (প্রতি লাখ জীবিত জন্মে)।

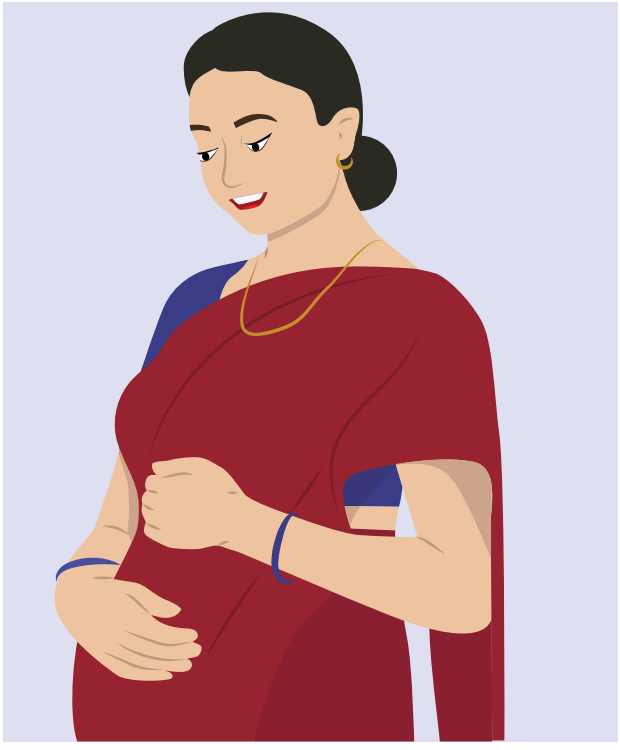

অধিকাংশ মৃত্যুই গর্ভ ও প্রসবজনিত প্রধান পাঁচটি জটিলতার কারণে হয়।
এগুলো হলো -

- অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ;
- একলাম্পশিয়া বা খিঁচুনি;
- বাধাপ্রাপ্ত প্রসব;
- অনিরাপদ গর্ভপাত;
- সংক্রমণজনিত জটিলতা।

গর্ভ ও প্রসবকালীন মায়ের ৫টি বিপদ চিহ্ন

ছবির যে কোন লক্ষণ দেখা দিলে দ্রুত নিকটস্থ হাসপাতাল বা ক্লিনিকে যেতে হবে

উল্লিখিত এই সকল মৃত্যু অধিকাংশই প্রতিরোধযোগ্য। প্রসবপূর্ব এবং প্রসবকালীন সেবা, প্রসব পরবর্তী সেবা, জরুরি প্রসূতি সেবা এবং প্রসবপরবর্তী পরিবার পরিকল্পনা সেবার মাধ্যমে মাতৃমৃত্যুর এই উচ্চহার কমিয়ে আনা যাবে।

নিরাপদ মাতৃত্বের উদ্দেশ্য

কার্যকর ও সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মাতৃমৃত্যুর হার কমিয়ে আনাই হলো নিরাপদ মাতৃত্বের মূল উদ্দেশ্য। বর্তমানে কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, জেলা সদর হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং সরকারি অনুমোদনপ্রাপ্ত এনজিও ক্লিনিকসমূহে নিরাপদ মাতৃত্ব সেবাপ্রদানের ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে।

নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করতে হলে নিম্নলিখিত বিষয় ও কৌশলের ওপর জোর দিতে হবে-

ক) গর্ভকালীন পরিচর্যা (Antenatal Care - ANC);

খ) জরুরি প্রসূতি সেবা (Essential Obstetric Care - EOC);

গ) নিরাপদ প্রসবের ব্যবস্থা (Safe Delivery);

ঘ) প্রসবোত্তর যত্ন (Postnatal Care - PNC);

ঙ) প্রসব পরবর্তী পরিবার পরিকল্পনা সেবা (Post-Partum Family Planning -PPFP)

চিত্র: গর্ভকালীন পরিচর্যা

চিত্র: জরুরি প্রসূতি সেবা

চিত্র: নিরাপদ প্রসবের ব্যবস্থা

চিত্র: প্রসব পরবর্তী পরিবার পরিকল্পনা সেবা

নিরাপদ মাতৃত্ব ও অধিকার

নিরাপদ মাতৃত্ব হচ্ছে প্রতিটি নারীর জন্মগত অধিকার। সকল পর্যায়ে এবং সকল নারীর জন্য নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের অন্যতম ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। একজন নারী গর্ভবতী হলে নিম্নবর্ণিত সেবা পাওয়ার অধিকার রাখেন-

- নিয়মিত প্রসবপূর্ব সেবা (কমপক্ষে চারবার) নেওয়া নিশ্চিত করা;
- দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীর মাধ্যমে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রসব ও চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা;
- প্রয়োজনে অনতিবিলম্বে জরুরি প্রসূতি সেবা নিশ্চিত করা;
- প্রসবোত্তর প্রয়োজনীয় সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা;
- প্রসব পরবর্তী পরিবার পরিকল্পনা সেবা নিশ্চিত করা।

এর ফলে একজন নারীর গর্ভকালীন, প্রসবকালীন বা প্রসব পরবর্তী জটিলতার কারণে মৃত্যু বা দীর্ঘমেয়াদি অসুস্থতার হার কমে আসবে।

নিরাপদ মাতৃত্বের ভিত্তি ও স্তম্ভসমূহ

নিরাপদ মাতৃত্ব অর্জন করতে হলে গর্ভকালীন, প্রসব ও প্রসব পরবর্তী সময়ে সকল মায়েদের জন্য উন্নত মাতৃস্বাস্থ্য সেবার ব্যবস্থা করতে হবে এবং তা সকলের আয়ত্বের মধ্যে যেন হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। নিরাপদ মাতৃত্ব অর্জন করতে নিম্নের চিত্রে উল্লিখিত উপাদান ও সেবাসমূহ নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক।

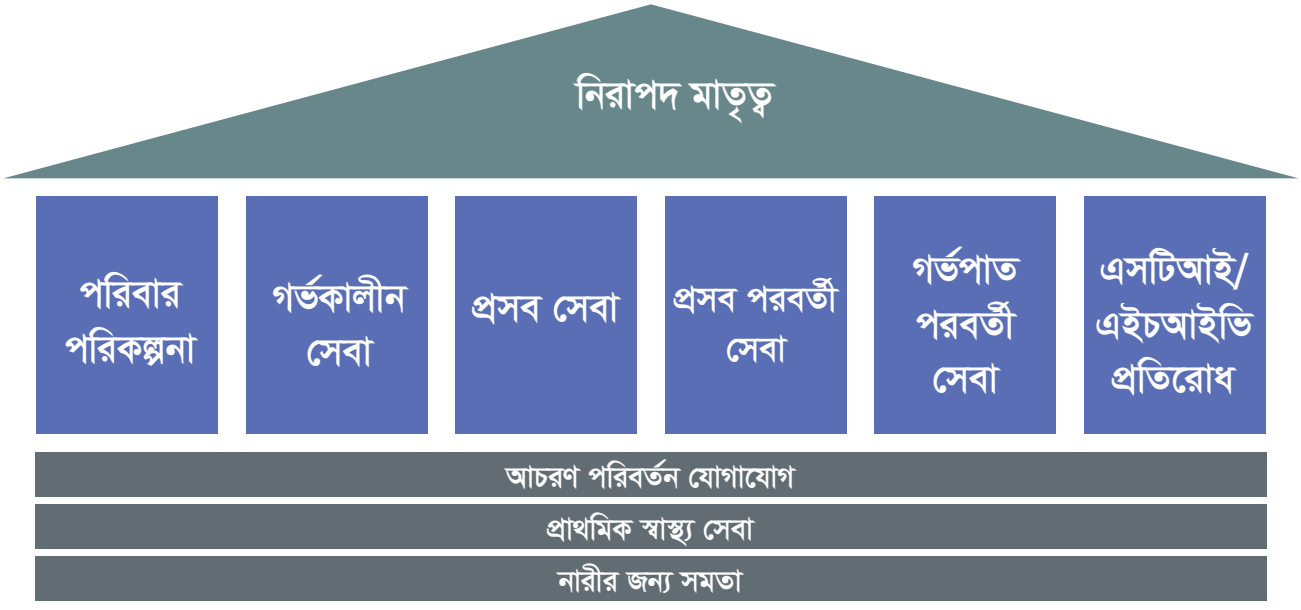

বিশেষ করে নিম্নের সেবাগুলো অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে

- প্রসবপূর্ব, প্রসবকালীন ও প্রসব পরবর্তী সময়ে দক্ষ সেবাপ্রদানকারীর মাধ্যমে সেবা প্রদান;
- জরুরি ও জীবনের প্রতি হুমকি স্বরূপ জটিলতার ক্ষেত্রে প্রসূতিকে রেফার করার ব্যবস্থাপনা ও সেবার ব্যবস্থা করা;
- বিপদজনক গর্ভপাতের জটিলতার যথাযথ ব্যবস্থাপনা ও প্রতিরোধমূলক সেবা নিশ্চিত করা;
- পরিকল্পিত গর্ভধারণ নিশ্চিত করতে ও অপরিকল্পিত গর্ভধারণ প্রতিরোধের জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণের পরামর্শ ও সেবা প্রদান করা;
- বয়ঃসন্ধিকালে স্বাস্থ্যশিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা;
- নারী, পরিবার ও তার সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের এবিষয়ে সামাজিক শিক্ষা প্রদান ও নারীর অধিকার রক্ষা ও ক্ষমতায়নে উদ্বুদ্ধ করা।
- গর্ভধারণের পূর্বে কাউন্সেলিং প্রদান করা

সেইসাথে জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য কার্যক্রমসমূহও অব্যাহত রাখতে হবে এবং এক্ষেত্রে ৫টি কৌশলের উপরে আলোকপাত করা হচ্ছে। এগুলি হচ্ছে-

১. সঠিক সময়ে প্রথম সন্তান জন্মদান করা;
২. সঠিক সময়ে উপযোগী জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করা;
৩. জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির গুণগত মান উন্নয়ন করা;
৪. প্রসব পরবর্তী (পিপিএফপি) জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারে অগ্রাধিকার প্রদান করা
৫. দীর্ঘমেয়াদী জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির উপর গুরুত্ব আরোপ করা।

চিত্র: সঠিক সময়ে প্রথম সন্তান জন্মদান করা

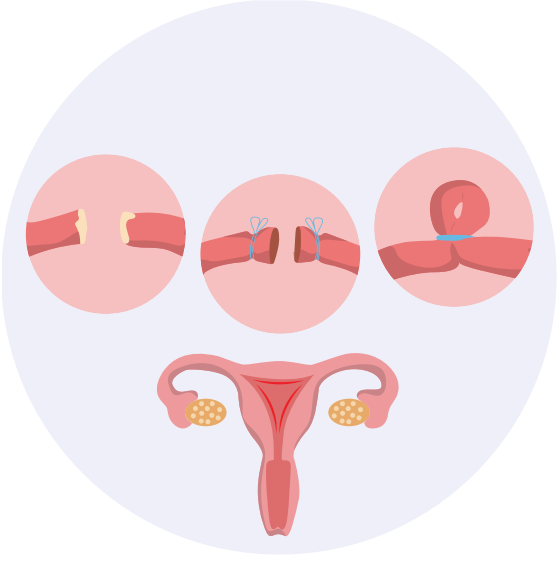

চিত্র: সঠিক সময়ে উপযোগী জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করা

চিত্র: জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির গুণগত মান উন্নয়ন করা

চিত্র: দীর্ঘমেয়াদী জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির উপর গুরুত্ব আরোপ করা

নিরাপদ মাতৃত্বের বাধাসমূহ

গর্ভবতী নারীদের স্বাস্থ্যসেবা না পাওয়ার প্রধান অন্তরায়গুলো হলো

• গর্ভকালীন বিপজ্জনক লক্ষণ ও ঝুঁকি চিহ্নিতকরণে দেরি	→	**সিদ্ধান্ত গ্রহণে দেরি**
• গর্ভাবস্থায় বিপজ্জনক লক্ষণ সম্পর্কে ধারণা না থাকা • গর্ভকালীন ও প্রসবোত্তর সেবার সুফল সম্পর্কে না জানা • মায়েদের শারীরিক জটিলতা ও দুর্বলতা • আর্থিক সমস্যা	→	**সিদ্ধান্ত গ্রহণে দেরি**
• সেবাকেন্দ্রের দূরত্ব • যানবাহনের অসুবিধা • পাহাড়ি ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাস (অপ্রতুল যোগাযোগ ব্যবস্থা) • চিকিৎসা ও যাতায়াত খরচ • সঙ্গে যাওয়ার লোকের অভাব • পারিবারিক অসহযোগিতা	→	**চিকিৎসা কেন্দ্রে যেতে দেরি**
• অপর্যাপ্ত ও অসফল রেফারেল ব্যবস্থা • সেবাগ্রহীতাকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে না দেখা • অপর্যাপ্ত সেবাপ্রদানকারী • সেবাপ্রদানকারীদের দক্ষতার অভাব • অপর্যাপ্ত সরঞ্জাম • প্রয়োজনীয় গ্রুপের রক্ত ও রক্তদাতার অভাব	→	**সঠিক চিকিৎসা পেতে দেরি**

অন্যান্য কারণ ও বাধাসমূহ

- দারিদ্র;
- সামাজিক রীতিনীতি;
- কুসংস্কার;
- নারীর প্রতি বৈষম্য ও নির্যাতন;
- শিক্ষার অভাব;
- অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ;
- মানসিক নির্যাতন;
- সামাজিক ও পারিবারিকভাবে নারীদের অবহেলা করা;
- সেবাগ্রহীতা নিজের পরিবারের কাছে থাকতে ইচ্ছুক;
- স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে পূর্বের তিক্ত অভিজ্ঞতা;
- সেবাপ্রদানকারীদের কাছ থেকে রূঢ় বা অসম্মানজনক আচরণ পাওয়া;
- জটিলতা বা মৃত্যুর কারণে ধাত্রীদের বদনামের ভয়;
- ধাত্রীদের নিজেদের সামাজিক অবস্থান হারাবার ভয়।

জরুরি প্রসূতি সেবা (Emergency Obstetric Care-EOC)

জরুরি প্রসূতি সেবা (EOC) হলো জরুরিভিত্তিতে প্রদানযোগ্য জীবন রক্ষাকারী চিকিৎসা ব্যবস্থা বা সেবা যার মাধ্যমে প্রসবজনিত জটিলতার (Obstetric Complications) কারণে গর্ভবতী মাকে মৃত্যু ও অসুস্থতা থেকে রক্ষা করা যায়। অনেকেই মনে করেন যে অভিজ্ঞ বা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, আধুনিক প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি সমন্বয়ে গঠিত ব্যয়বহুল হাসপাতাল না থাকলে জরুরি প্রসূতি সেবা বা EOC প্রদান সম্ভব নয়। কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয়। বরং সহজে প্রদানযোগ্য এমন অনেক চিকিৎসা ব্যবস্থা আছে যা জরুরি যেকোনো স্বাস্থ্যকেন্দ্র (যেমন- ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র) থেকে যথাযথভাবে প্রদান করে অনেক মা ও শিশুর জীবন বাঁচানো সম্ভব।

মাতৃমৃত্যু কীভাবে রোধ করা যায়

মাতৃমৃত্যু ও অসুস্থতা থেকে নিম্নলিখিত কার্যক্রমের মাধ্যমে আমাদের দেশের নারীদের রক্ষা করা যায়-

- পরিবার পরিকল্পনা
- গর্ভকালীন যত্ন
  - টিটি টিকাদান
  - ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভ চিহ্নিতকরণ
  - আয়রন ফলিক ট্যাবলেট বিতরণ
  - ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট বিতরণ
- নিরাপদ প্রসবের জন্য জনসচেতনতা গড়ে তোলা।

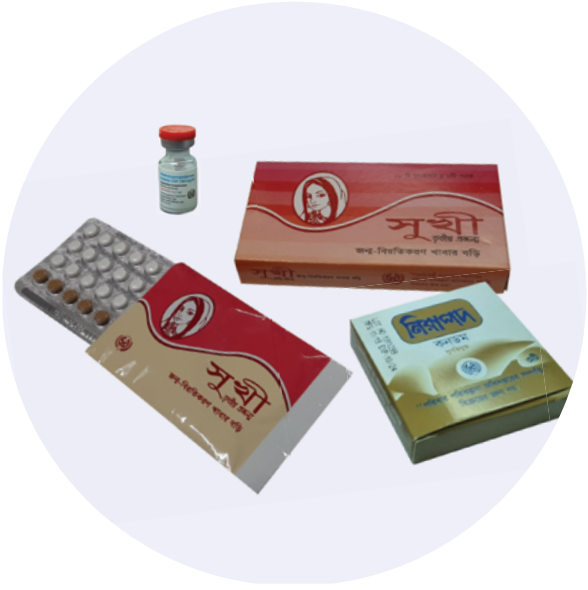

চিত্র: পরিবার পরিকল্পনা

চিত্র: টিটি টিকাদান

চিত্র: গর্ভকালীন যত্ন

চিত্র: আয়রন ফলিক ট্যাবলেট বিতরণ

পরিবার পরিকল্পনা

- অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণ রোধ করার মাধ্যমে বিপদজনক গর্ভপাত (যা মা'র অসুস্থতা ও মৃত্যুর কারণ হয়) ব্যবস্থা গ্রহণ থেকে বিরত রাখে;
- বারবার গর্ভধারণের মাধ্যমে নারীদের গর্ভজনিত জটিলতায় আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি থেকে রক্ষা করে।

গর্ভকালীন যত্ন

- গুণগত মানসম্মত গর্ভকালীন যত্নের মাধ্যমে কতিপয় জটিলতা (যেমন: প্রি-একলাম্পশিয়া) সনাক্ত করে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করা;
- প্রসবজনিত জটিলতা সম্পর্কে সচেতনতাবৃদ্ধি করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য পরামর্শ দান করা;
- পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রেখে নিরাপদভাবে প্রসব করাতে উৎসাহী করা;
- সেবাপ্রদানকারী সেবা প্রদানের দক্ষতা থাকা এবং গ্রহীতার সাথে সৌজন্যমূলক/ভদ্র আচরণ করা

জরুরি প্রসূতি সেবা (ইওসি) সংক্রান্ত যোগাযোগ ও কাউন্সেলিং

জরুরি প্রসূতি সেবার জন্য যোগাযোগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সফল যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত না হলে ইওসি-এর উদ্দেশ্য সাধন হওয়া খুবই দুরূহ ব্যাপার। সফল যোগাযোগের ক্ষেত্রে মাধ্যম নির্ধারণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই কারণেই পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা এবং পরিবার কল্যাণ সহকারীদের এ বিষয়ে যথাযথ জ্ঞান ও দক্ষতা থাকা প্রয়োজন।

গর্ভকালীন ৫টি প্রধান বিপদ চিহ্ন	
গর্ভকালীন ৫টি প্রধান বিপদ চিহ্ন জনগোষ্ঠীকে অবহিত করুন এবং এর যেকোনো একটি দেখা দিলে নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যোগাযোগ করতে বলুন।	
গর্ভবস্থায় রক্তস্রাব	• প্রসবের সময় বা • প্রসবের পরে খুব বেশি রক্তস্রাব • গর্ভফুল না পড়া
মাথাব্যথা, পা ফুলা ও চোখে ঝাপসা দেখা	• গর্ভাবস্থায়, প্রসবকালে ও প্রসবের পরে শরীরে পানি আসা • খুব বেশি মাথাব্যথা • পা ফুলে যাওয়া • চোখে ঝাপসা দেখা
ভীষণ জ্বর	• গর্ভাবস্থায় বা প্রসবের পর তিনদিনের বেশি জ্বর • দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব
খিঁচুনি	• গর্ভাবস্থায় • প্রসবের সময় বা • প্রসবের পরে খিঁচুনি
বিলম্বিত প্রসব	• প্রসবব্যথা ১২ ঘণ্টার বেশি থাকা • প্রসবের সময় শিশুর মাথা ছাড়া অন্য কোনো অঙ্গ প্রথমে বের হওয়া।

নবজাতকের অত্যাবশ্যকীয় সেবা (Essensial Newborn Care)

প্রসব পরবর্তী যত্ন

- শিশুর জন্মের পর থেকে ৪২ দিন পর্যন্ত কমপক্ষে ৪ বার সেবাকেন্দ্রে গিয়ে/সেবাপ্রদানকারীদের দ্বারা মায়ের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে হবে।
- প্রসবের পর মা'কে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে। মাসিকের সময় স্যানিটারি ন্যাপকিন অথবা রোদে শুকানো পরিষ্কার কাপড় ব্যবহার করতে হবে। এসময় নিয়মিত গোসল করতে হবে।
- প্রসবের পর ৩ মাস পর্যন্ত মা'কে প্রতিদিন ১টি করে আয়রন ও ফলিক এসিড বড়ি খেতে হবে।
- প্রসবের ৬ সপ্তাহের মধ্যে মা'কে ১টি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খেতে হবে।
- প্রতিদিন মা'কে হালকা পরিশ্রম ও একটু হাঁটা-হাঁটি করতে হবে।
- প্রসবের পর মায়ের শরীর ক্লান্ত থাকে, তাই মা'কে পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিতে হবে। দুপুরে ২ ঘণ্টা বিশ্রাম নিতে হবে এবং রাতে ৮ ঘণ্টা ঘুমাতে হবে।
- নিজের ও শিশুর স্বাস্থ্যের জন্য মা'কে বেশি পরিমাণে পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে।
- প্রসবের পর প্রতিদিন ৩ বেলা খাবারের সময় ২ মুঠো বেশি খেতে হবে।
- খাবার যেমন- ভাত, ডাল, ডিম/মাছ/মাংস, ফল, দুধ, সবুজ শাক-সবজি, কচুশাক, লাউশাক, পাটশাক, লালশাক, কাঁচা কলা, মিষ্টি কুমড়া, গাজর, পাকা কলা, পেঁপে খেতে হবে ও প্রচুর পরিমাণে পানি পান করতে হবে।
- প্রসব পরবর্তী বিপদচিহ্ন সম্পর্কে জানা থাকতে হবে এবং প্রয়োজনে দ্রুত সেবাকেন্দ্রে যেতে হবে।

নবজাতকের অত্যাবশ্যকীয় সেবা

জন্মের সাথে সাথে শিশুকে নিচে উল্লিখিত অত্যাবশ্যকীয় সেবাগুলো প্রদান করতে হবে-

১. জন্মের এক মিনিটের মধ্যে শিশুকে পরিষ্কার, শুকনা নরম সুতিকাপড় দিয়ে আলতো চাপ দিয়ে ভালোভাবে মুছিয়ে দিতে হবে;

২. জীবাণুমুক্ত উপায়ে নাড়ী বাঁধা ও কাটার পর নাভিতে ৭.১% ক্লোরোহেক্সিডিন লাগাতে হবে;

৩. মুছিয়ে দেওয়ার সাথে সাথে মায়ের ত্বকের স্পর্শে রাখা এবং পরবর্তীতে মাথা ও শরীর কাপড়ে মুড়িয়ে শিশুকে উষ্ণ রাখতে হবে;

৪. জন্মের এক ঘণ্টার মধ্যে অবশ্যই মায়ের দুধ খাওয়াতে হবে;

৫. জন্মের তিনদিনের মধ্যে কোনোভাবেই শিশুকে গোসল করানো যাবে না।

চিত্র: জন্মের এক মিনিটের মধ্যে শিশুকে পরিষ্কার করা

চিত্র: নাড়ী বাঁধা ও কাটার পর নাভিতে ৭.১% ক্লোরোহেক্সিডিন লাগাতে হবে

চিত্র: মুছিয়ে দেওয়ার সাথে সাথে মায়ের ত্বকের স্পর্শে রাখা

চিত্র: জন্মের এক ঘণ্টার মধ্যে অবশ্যই মায়ের দুধ খাওয়াতে হবে

চিত্র: জন্মের তিনদিনের মধ্যে কোনোভাবেই শিশুকে গোসল করানো যাবে না

এছাড়াও নবজাতকের নিচে উল্লিখিত যেকোনো বিপদ চিহ্ন দেখা দিলে দ্রুত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যেতে হবে:

- দ্রুত শ্বাস নেওয়া অথবা বুকের খাঁচা ডেবে যাওয়া;
- মায়ের দুধ টানতে না পারা;
- জ্বর বা শরীর ঠান্ডা হওয়া;
- নেতিয়ে পড়া;
- খিঁচুনি;
- নাভি পাকা।

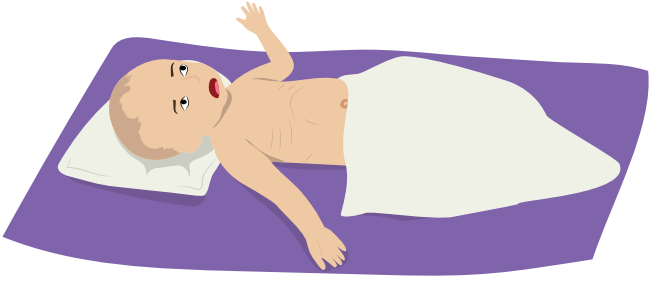

চিত্র: দ্রুত শ্বাস নেওয়া অথবা বুকের খাঁচা ডেবে যাওয়া

চিত্র: মায়ের দুধ টানতে না পারা

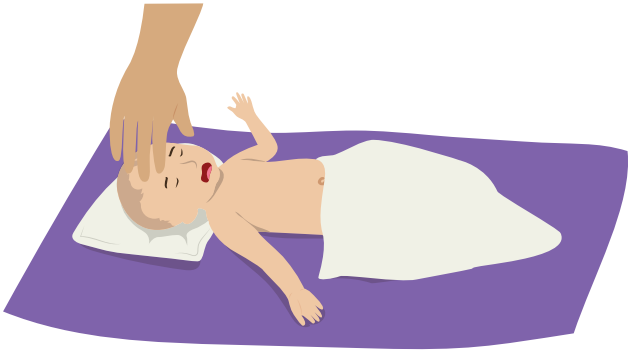

চিত্র: জ্বর বা শরীর ঠান্ডা হওয়া

চিত্র: নেতিয়ে পড়া

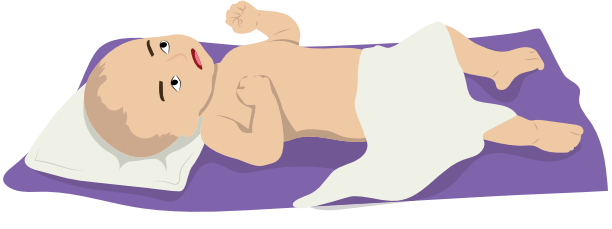

চিত্র: খিঁচুনি

চিত্র: নাভি পাকা

অধ্যায়-৬

যৌন ও জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা এবং নারী ও শিশু নির্যাতন

যৌন ও জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা এবং নারী ও শিশু নির্যাতন

ভূমিকা

জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে। তবে ক্ষতিগ্রস্ত হন সাধারণত একজন নারী। সমাজ ও রাষ্ট্রে নারী ও পুরুষের ক্ষমতার অসমতার কারণে মূলত এই সহিংসতা ঘটে। জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা অমানবিক কার্যকলাপ যা সরাসরি মানবাধিকারের লঙ্ঘন।

যৌন ও জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার সংজ্ঞা

জাতিসংঘ নারীর প্রতি সহিংসতা নির্মূল সনদে যেভাবে সহিংসতা সংজ্ঞায়িত করেছে-

"জনসমক্ষে বা ঘরোয়া পরিবেশে ঘটে বা ঘটতে পারে এমন কোনো কাজ বা এসকল কাজের হুমকি, যাতে নারীর চলাফেরা বাধাগ্রস্ত হয়, বঞ্চনা ও লাঞ্ছনাগ্রস্ত হয় এবং যা নারীদের দৈহিক, যৌনতা সংক্রান্ত অথবা মানসিক ক্ষতি ও কষ্টের কারণ হয়।"

জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার ধরনঃ

ধর্ষণ, ফতোয়াজনিত সহিংসতা, একঘরে করা, যৌন নিপীড়ন, বৌ পিটানো, পতিতাবৃত্তিতে নিয়োগ, লেখাপড়া শিখতে না দেওয়া, চলাফেরায় বাধা দেওয়া, গায়ে হাত দেওয়া, নিষ্ঠুর আচরণ করা, গালমন্দ করা প্রভৃতি শারীরিক, মানসিক যৌন নির্যাতন ও আর্থিক ক্ষতি সাধন জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা। জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা সামাজিক জীবনে, পারিবারিক জীবনে ও ব্যক্তিগত জীবনেও ঘটে। সহিংসতার কারণে নারীরাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন।

জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার ধরন নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

- পারিবারিক নির্যাতন
- যৌন নির্যাতন
- যৌতুক
- তালাক

পারিবারিক নির্যাতন

পারিবারিকভাবে নারী নির্যাতন হলো সমাজের একটি অনালোচিত, অন্ধকার ও স্পর্শকাতর দিক। পারিবারিক নির্যাতন শারীরিক, মানসিক, যৌন নির্যাতন ও আর্থিক ক্ষতি সাধনসহ বিভিন্ন উপায়ে হতে পারে। নারীর মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা সবচেয়ে বেশি ব্যক্তি বিশেষের মাধ্যমে ব্যক্তিগত জীবনের পরিধিতে ঘটে থাকে। স্বামী, শাশুড়ি, ননদ ও পরিবারের অন্যান্য পুরুষ সদস্য কর্তৃক গৃহবধূ বা গৃহকর্মীকে নির্যাতনের ঘটনা অহরহ ঘটে। পরিবারে শিশু নির্যাতনের ঘটনাও সংবাদের শিরোনাম হয়। স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে নির্যাতন করা অনেক ক্ষেত্রে স্বাভাবিক বলে মনে করা হয়। শুধু তাই নয়, কিছু কিছু সমাজ ব্যবস্থা নানাভাবে এমন পশ্চাদপদ ধ্যান-ধারণা টিকিয়ে রাখে, যা গৃহের অভ্যন্তরে নারী নির্যাতনকে মদদ দেয় বা মেনে নিতে অভ্যস্ত করে তোলে। অন্যদিকে গোপনীয়তা, চক্ষু লজ্জা, অপর্যাপ্ত নিদর্শন, সামাজিক বিধিনিষেধ ইত্যাদি নানা কারণে পারিবারিক সহিংতা সম্বন্ধে তথ্য পাওয়াটাও কঠিন হয়ে পড়ে।

যৌন নির্যাতন

১. যৌন নিপীড়ন (Sexual Abuse)
২. যৌন হয়রানি (Sexual Harassment)
৩. যৌন সহিংসতা (Sexual Violence)

যৌন নিপীড়ন (Sexual Abuse):

যেকোনো ধরনের সম্মতিহীন যৌন আচরণ। এটা যেকোনো বয়সের নারী-পুরুষের বেলায় হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ-

- সঙ্গীকে আপত্তিকর নামে ডাকা;
- জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারে অসম্মতি জ্ঞাপন;
- যৌনমিলনকালে ইচ্ছাকৃতভাবে শারীরিকভাবে আঘাত করা;
- নানা ধরনের উপাদান (তেল বা লুব্রিকেন্ট) ব্যবহার করে জোরপূর্বক যৌনক্রিয়া।

যৌন হয়রানি (Sexual Harassment):

যৌনতার সাথে সম্পর্কিত কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ; যেমন- পাশ দিয়ে কোনো নারী হেঁটে যাওয়ার সময় যদি কোন পুরুষ শিস বাজায় অথবা কোনো নারী তার দিকে হেঁটে আসার সময় যদি কোনো পুরুষের আপদমস্তক লক্ষ্য করে তাকায় ইত্যাদি। যৌন হয়রানি মৌখিক (Verbal), মৌন (Non-verbal) বা শারীরিক (Physical) হতে পারে।

- যৌন হয়রানি যেকোনো স্থানে হতে পারে- কর্মস্থল, স্কুল অথবা যেকোনো জায়গায়;
- নিপীড়নকারী নারী, পুরুষ অথবা নির্যাতিত ব্যক্তি যে কেউ হতে পারে;
- যৌন হয়রানির শিকার ও হয়রানিকারী বিপরীত লিঙ্গের নাও হতে পারে।

যৌন সহিংসতা (Sexual Violence):

জোরপূর্বক যেকোনো ধরনের যৌন সর্ম্পক স্থাপন বা স্থাপনের চেষ্টা, যৌনতার সাথে সম্পর্কিত কোনো অপ্রত্যাশিত উক্তি, যৌনক্রিয়ার উদ্দেশ্যে অথবা কোনো কারণে পাচার, অথবা প্রলোভন দেখিয়ে বা চাপ প্রয়োগ করে ইচ্ছার বিরুদ্ধে যৌনকর্ম করে বা করার চেস্টা করে, এক্ষেত্রে নির্যাতিতের সাথে নির্যাতনকারীর কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে আবার নাও থাকতে পারে। এটা ঘটনা শুধুমাত্র ঘরে বা কর্মস্থলেই সীমাবদ্ধ নয়, যেকোনো স্থানে তা ঘটতে পারে।

- যৌন সহিংসতা যেকোনো পরিবেশ পরিস্থিতিতে হতে পারে।
- নারী ও শিশুরা সবচেয়ে বেশি যৌন সহিংসতার শিকার হতে পারে।

নারীর প্রতি সহিংসতা দুইভাবে হতে পারে

১. শারীরিক সহিংসতা

২. মানসিক সহিংসতা।

চিত্র: শারীরিক সহিংসতা

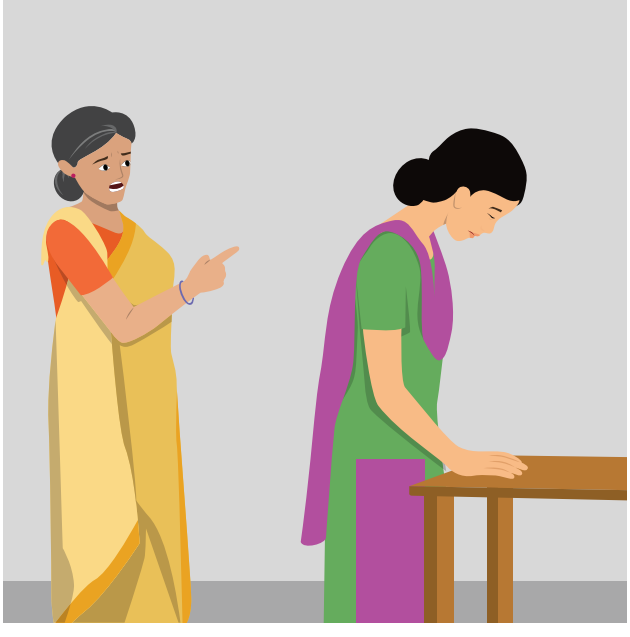

চিত্র: মানসিক সহিংসতা

শারীরিক সহিংসতা: শারীরিক আঘাত, ধর্ষণ, এসিড নিক্ষেপ, যৌন হয়রানি, কর্মস্থল বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন নিপীড়ন, অপহরণ, পাচার, বাধ্যতামূলক পতিতাবৃত্তি, খুন ইত্যাদি।

মানসিক সহিংসতা: অশ্লীল গালাগালি, ইভ-টিজিং, ভয়-ভীতি প্রদর্শন, আত্মহত্যার প্ররোচনা।

জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার শিকার হলে ব্যক্তিজীবনে নিম্নোক্ত প্রতিক্রিয়াগুলো পরিলক্ষিত হয়-

- ভয়, নিরাপত্তাহীনতা, অনিদ্রা;
- অপরাধবোধ, লজ্জাবোধ, বিব্রতবোধ;
- আত্মহনন, আত্ম ধ্বংসাত্বক আচরণ;
- হয়রানির ভীতি;
- ড্রাগ, নেশা, সন্ত্রাস, অসামাজিক কার্যকলাপ।

কর্মক্ষেত্রে যৌন নির্যাতন

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সরকারি-বেসরকারি অফিস, শিল্প কারখানায় নারী কর্মীরা কাজ করেন। এইসব কর্মক্ষেত্রেও নারীরা নিপীড়ন ও হয়রানি ভোগ করেন। পুরুষ সহকর্মী বা ঊর্ধ্বতন সুপারভাইজার, কর্মকর্তা কর্তৃক শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন নতুন কোনো ঘটনা নয়।

উদ্দেশ্যমূলকভাবে নারী সহকর্মীর গায়ে হাত দেওয়া; যৌনতার সাথে সম্পর্কিত কোনো অপ্রত্যাশিত উক্তি করা; যৌন সুড়সুড়িমূলক জোকস, উক্তি, অঙ্গভঙ্গি বা আকার ইঙ্গিতে উত্যক্ত করা, উদ্দেশ্যমূলকভাবে অপ্রত্যাশিত কাজ চাপিয়ে দেওয়া; ছুটি বা কোনো সুযোগ-সুবিধা প্রদানে ইচ্ছাকৃত বিলম্ব বা অনিহা প্রকাশ করা; চাকরি হারানোর ভয়-ভীতি দেখানো এসবই হয়রানি ও নিপীড়নের অন্তর্ভুক্ত। শুধু পুরুষ নয় নারী সহকর্মী, ঊর্ধ্বতন নারী সুপারভাইজার, নারী কর্মকর্তা কর্তৃকও এরকম নির্যাতন হতে পারে। যেসব সংস্থায়, শিল্প-কারখানায় অধিক সংখ্যক নারী কর্মী কাজ করেন সেসব ক্ষেত্রে নিপীড়ন ও হয়রানির আশঙ্কা বেশি থাকে। এক্ষেত্রে ঘনিষ্ট/বন্ধু সহকর্মীর দ্বারা নিপীড়ন ও হয়রানির আশঙ্কা বেশি থাকে। নিপীড়িত ও নির্যাতিতজন লজ্জা, মান-সম্মানের ভয়, চাকরি হারানোর ভয়, সামাজিকভাবে লাঞ্চিত হওয়ার ভয় এসব কারণে অভিযোগ করা থেকে বিরত থাকে। ফলে এই বিষয়গুলো চাপা থেকে যায়।

যৌতুক

আমাদের দেশে যৌতুক বলতে বাধ্যতামূলকভাবে বিয়ের পূর্বশর্ত হিসেবে মেয়েপক্ষ ছেলেপক্ষকে অথবা একপক্ষ অন্যপক্ষকে বিয়ের সময়/বিয়ের আগে/পরে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন মূল্যবান জিনিস, সম্পদ, অর্থ ইত্যাদি প্রদান করাকে বুঝায়।

বাংলাদেশের যৌতুক গ্রহণ বা প্রদান নিরোধ আইন ২০১৮ অনুযায়ী যৌতুকের সংজ্ঞা

"যৌতুক" অর্থ বিবাহের এক পক্ষ কর্তৃক অন্য পক্ষের নিকট বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের পূর্বশর্ত হিসাবে বিবাহের সময় বা তৎপূর্বে বা বৈবাহিক সম্পর্ক বিদ্যমান থাকাকালে, বিবাহ অব্যাহত রাখিবার শর্তে, বিবাহের পণ বাবদ, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, দাবিকৃত বা বিবাহের এক পক্ষ কর্তৃক অপর পক্ষকে প্রদত্ত বা প্রদানের জন্য সম্মত কোনো অর্থ-সামগ্রী বা অন্য কোনো সম্পদ। তবে মুসলিম ব্যক্তিগত আইন (শরিয়াহ্) প্রযোজ্য হয় এমন ব্যক্তিগণের ক্ষেত্রে দেনমোহর বা মোহরানা অথবা বিবাহের সময় বিবাহের পক্ষগণের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব বা শুভাকাঙ্ক্ষী কর্তৃক বিবাহের কোনো পক্ষকে প্রদত্ত উপহার-সামগ্রী ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

যৌতুকের কারণ

- আমাদের দেশে অনেকেই যৌতুককে সামাজিক মর্যাদার মাপকাঠি হিসেবে মনে করে। বিয়েতে যত বেশি যৌতুক আদায় করা যায় বা দেওয়া যায় ততই যেন সম্মান বেড়ে যায়। কখনো ছেলে নিজে, তার বাবা-মা বা অভিভাবকরা যৌতুক দাবি করে।
- আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় মেয়েদের দেখা হয় অন্যের ওপর নির্ভরশীল হিসেবে। ছেলেপক্ষ মনে করে একটা মেয়েকে বিয়ে করা মানে তাকে ও তার মা-বাবাকে সমূহ-বিপদ থেকে উদ্ধার করা। তাই ছেলেপক্ষ মেয়েপক্ষের কাছ থেকে কিছু সুযোগ-সুবিধা পেতে চায়।
- দেনমোহরের দায়িত্ব যেহেতু ছেলেপক্ষের, সেজন্য ছেলেপক্ষ চায় দেনমোহরের টাকাগুলো উঠে আসুক।
- অনেক সময় এগুলো পরিবেশ, পরিস্থিতির উপরও নির্ভর করে। ছেলেপক্ষ আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে, ছেলের পড়াশুনার খরচ চালানোর জন্য বা ছেলে বেকার হলে ব্যবসা করার জন্য যৌতুক চায়।

যৌতুক দাবী করার শাস্তি

- বাংলাদেশের আইনে যৌতুক দেওয়া এবং নেওয়া দুটোই সমান অপরাধ। কেউ যৌতুক দেওয়া নেওয়া করলে তার বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করা যাবে। অপরাধ প্রমাণিত হলে তার বিরুদ্ধে শাস্তির বিধান আছে।
- বর বা কনে পক্ষ যদি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যৌতুক দাবী করেন তাহলে সেই অপরাধে তাদের অনধিক ৫ বছর ও অনূন্য এক বছর কারাদণ্ড ও অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।
- বর বা কনে পক্ষ যদি যৌতুক প্রদান বা গ্রহণ করেন অথবা যৌতুক প্রদান বা গ্রহণে সহায়তা করেন বা যৌতুক প্রদান বা গ্রহণের উদ্দেশ্যে চুক্তি করেন তাহলে সেই অপরাধে তাদের অনধিক ৫ বছর ও অনূন্য এক বছর কারাদণ্ড ও অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।
- কোনো পক্ষই যৌতুক দেওয়া নেওয়ার ব্যাপারে কোনো চুক্তি করতে পারবে না। যদি করে তা আইনত বাতিল বা ফলবিহীন বলে গণ্য হবে।
- যদি কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তির ক্ষতি সাধনের জন্য মিথ্যা মামলা দায়ের করেন তাহলে সেই অপরাধে তাদের অনধিক ৫ বছর কারাদণ্ড ও অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।
- অনেক সময় দেখা যায় বিয়ের পর স্বামী যৌতুকের জন্য স্ত্রীকে নির্যাতন করে। স্বামীর পরিবারও যৌতুকের জন্য বিভিন্নভাবে চাপ দিতে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে নির্যাতনের কারণে মেয়েটির মৃত্যু হয় অথবা নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে মেয়েটি আত্মহত্যা করে। যৌতুকের কারণে মৃত্যু ঘটানোর জন্য মৃত্যুদণ্ডে বা মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টার জন্য নারী নির্যাতন আইনে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার বিধান রয়েছে।

যৌতুকের বিচারের জন্য কোথায় যেতে হবে

যৌতুক নিয়ে কোনো ধরণের নির্যাতন হলে স্ত্রী বা তার বাবা মা

- স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ
- স্থানীয়/ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয়
- এবিষয়ে আইনি সহায়তা দেয় এমন এনজিও এবং
- ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে বিচার চাইতে পারেন।

তালাক

তালাক-এর প্রক্রিয়া বা শর্তসমূহ

স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিভিন্ন কারণে ভুল-বুঝাবুঝি হলে প্রথমে তা সমাধানের চেষ্টা করা উচিত। যদি বিবাদ মেটানো সম্ভব না হয় তবে অশান্তি জিইয়ে না রেখে স্বামী স্ত্রীকে বা স্ত্রী স্বামীকে তালাক দিতে পারে। মুখে তালাক দিলে আইনত তা গ্রহণযোগ্য নয়। তালাক দিতে হলে সুনির্দিষ্ট কারণ উল্লেখ করে নোটিশ দিতে হবে। ৩০ দিনের মধ্যে সালিশের চেষ্টা করা যায়। বিবাদ মিটে গেলে তালাক কার্যকর হবে না। বিবাদ না মিটলে নোটিশ পাঠানোর ৯০ দিনের পর তালাক কার্যকর হবে।

শারীরিক প্রভাব	
মারাত্মক প্রভাব (Fatal Outcomes) • অন্যকে হত্যা করার প্রবণতা • আত্মহত্যা • মাতৃমৃত্যু • শিশুমৃত্যু • এইডস সম্পর্কিত জটিলতা ও মৃত্যু।	**তীব্র শারীরিক প্রভাব (Acute Physical Outcomes)** • ক্ষত • প্রচণ্ড আঘাত • রোগাক্রান্ত • জীবাণু সংক্রমণ।
দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব (Chronic Physical Outcomes) • অক্ষমতা • শারীরিক সমস্যাজনিত লক্ষণ • দীর্ঘস্থায়ী সংক্রমণে আক্রান্ত • দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা • পরিপাকতন্ত্রের সমস্যা • ক্ষুধামন্দা • অনিদ্রা • মাদকাসক্তি ও নেশা।	**প্রজনন ক্ষেত্রে প্রভাব (Reproductive Outcomes)** • গর্ভপাত • অপ্রত্যাশিত গর্ভধারণ • অনিরাপদ গর্ভপাত • যৌনবাহিত সংক্রমণ • মাসিকের সমস্যা • গর্ভধারণে জটিলতা, বন্ধাত্ব • গাইনিকোলজিক্যাল সমস্যা • যৌন সমস্যা।

মানসিক প্রভাব

- আঘাতজনিত যন্ত্রণা
- বিষণ্নতা
- উদ্বেগ, ভয়
- রাগ
- লজ্জা, হীনমন্যতা
- নিরাপত্তহীনতা, নিজেকে দোষারোপ করা
- আত্মঘৃণা, আত্মহত্যার চিন্তা, জীবননাশের চেষ্টা করা
- মানসিক বৈকল্য ও অন্যান্য মানসিক সমস্যা

সামাজিক প্রভাব

- অপরাধে কলঙ্কিত হওয়া
- কমিউনিটি কর্তৃক কাজ করার ক্ষমতা হারানো
- অর্থ উপার্জন ব্যহত হওয়া
- শুধুমাত্র সন্তান লালন পালন করা
- সামাজিক লজ্জা
- সামাজিকভাবে প্রত্যাখ্যাত এবং পৃথকীকরণ
- স্বামী/স্ত্রী অথবা পরিবারের সদস্য দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হওয়া)

যৌন হয়রানি ও নির্যাতনের শাস্তি

দণ্ডবিধির ২৯৪ ধারায় বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি অন্যদের বিরক্তি সৃষ্টি করে, কোনো প্রকাশ্য স্থানের কাছাকাছি কোনো অশ্লীল কাজ করে অথবা প্রকাশ্য স্থানে কোনো অশ্লীল গান, সংগীত বা পদাবলি গায়, আবৃত্তি করে বা উচ্চারণ করে; সেই ব্যক্তি তিন মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হবে।

দণ্ডবিধির ৫০৯ ধারায় বলা আছে, কেউ যদি কোনো নারীর শ্লীলতাহানির উদ্দেশ্যে কথা, অঙ্গভঙ্গি বা কোনো কাজ করে, তাহলে দায়ী ব্যক্তিকে এক বছর পর্যন্ত যেকোনো মেয়াদের সাজা বা অর্থদণ্ড কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ অধ্যাদেশের ৭৬ ধারায় বলা হয়েছে, যদি কেউ রাস্তায় বা সাধারণের ব্যবহার্য স্থানে বা সেখান থেকে দৃষ্টিগোচরে স্বেচ্ছায় এবং অশালীনভাবে নিজের শরীর এমনভাবে প্রদর্শন করে, যা কোনো গৃহ বা দালানের ভেতর থেকে হোক বা না হোক কোনো নারী দেখতে পায় বা স্বেচ্ছায় কোনো রাস্তায় বা সাধারণের ব্যবহার্য স্থানে কোনো নারীকে পীড়ন করে বা তার পথ রোধ করে বা কোনো রাস্তায় বা সাধারণের ব্যবহার্য স্থানে অশালীন ভাষা ব্যবহার করে, অশ্লীল আওয়াজ, অঙ্গভঙ্গি বা মন্তব্য করে নারীকে অপমান বা বিরক্ত করে, তবে সেই ব্যক্তি এক বছর মেয়াদের কারাদণ্ড অথবা দুই হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০২০ অনুযায়ী শাস্তি

- যদি কোনো ব্যক্তি তার যৌন কামনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে তার শরীরের কোনো অঙ্গ বা অন্য কোনো বস্তু দ্বারা কোনো নারী বা শিশুর যৌনাঙ্গ বা অন্য কোনো অঙ্গ স্পর্শ করে বা শ্লীলতাহানি করে তাহলে তাকে অনধিক দশ বছর কিন্তু ন্যূনতম তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে এবং অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।
- কোনো ব্যক্তি কোনো নারীকে জখম করেন তবে তাকে মারাত্মক জখম করার জন্য অনধিক বারো বছর কিন্তু অনূন্য পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে এবং অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।
- কোনো ব্যক্তি কোনো নারীকে সাধারণ জখম করেন তবে তাকে অনধিক তিন বছর কিন্তু অনূন্য এক বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে এবং অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।
- যদি কোনো ব্যক্তি দহনকারী, ক্ষয়কারী বা বিষাক্ত পদার্থ দ্বারা কোনো শিশু বা নারীর মৃত্যু ঘটান বা ঘটানোর চেষ্টা করেন তাহলে উক্ত ব্যক্তি তাকে মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবেন এবং অতিরিক্ত অনধিক এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।
- যদি কোনো ব্যক্তি দহনকারী, ক্ষয়কারী বা বিষাক্ত পদার্থ দ্বারা কোনো শিশু বা নারীর দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি নষ্ট, মুখমণ্ডল বা কোনো অঙ্গের বিকৃতি তাহলে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড চৌদ্দ বছর বা সাত বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবেন এবং অতিরিক্ত অনধিক এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।
- যদি কোনো ব্যক্তি কোনো শিশু বা নারীকে অপহরণ করেন ও মুক্তিপণ দাবী করেন তাহলে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবেন এবং অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।
- যদি কোনো পুরুষ কোনো শিশু বা নারীকে ধর্ষণ করেন তাহলে তাকে মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবেন এবং অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।
- যদি কোনো পুরুষ কোনো শিশু বা নারীকে ধর্ষণ করেন এবং পরবর্তীতে শিশু বা নারীর মৃত্যু ঘটে তাহলে তাকে মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবেন এবং অতিরিক্ত অনধিক এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।
- যদি কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তির ক্ষতি সাধনের জন্য এই আইনে মিথ্যা মামলা দায়ের করেন তাহলে সেই অপরাধে তাদের অনধিক সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও অতিরিক্তি অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

এছাড়া হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী ইভ-টিজিং বা উত্যক্তকরণ একটি যৌন নির্যাতন হিসেবেও গণ্য হবে। ভ্রাম্যমাণ আদালত শাস্তি হিসেবে সর্বোচ্চ দুই বছর সাজা দিতে পারেন। কোনো নারীকে বিরক্ত করার জন্য ভিডিও বা ছবি তুলে কোনো অনলাইনে প্রকাশ করলে সাইবার অপরাধ হিসেবেও গণ্য হবে, যার শাস্তি কমপক্ষে সাত বছরের জেল এবং জরিমানা।

ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার (ওসিসি)

বিভাগীয় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসমূহে অবস্থিত ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার (ওসিসি) নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রামের একটি মূখ্য কর্মসূচি। নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের প্রয়োজনীয় সেবা একইস্থান বা কেন্দ্র থেকে প্রদান করার ধারণার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে ওসিসি।

ওসিসি প্রদত্ত সেবা:

ক. স্বাস্থ্যসেবা

খ. পুলিশি সহায়তা

গ. ডিএনএ পরীক্ষা

ঘ. সামাজিক সেবা

ঙ. আইনি সহায়তা

চ. মনোসামাজিক কাউন্সেলিং

ছ. আশ্রয় সেবা।

ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেল (ওসিসি)

দেশব্যাপী নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের সেবা প্রাপ্তির সুবিধার্থে ৪০টি জেলা সদর হাসপাতাল এবং ২০টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে মোট ৬০টি ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেল স্থাপন করা হয়েছে। সেলসমূহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকারি সংস্থা, বেসরকারি সংগঠন, সুশীল সমাজ এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সাথে যোগসূত্র স্থাপন করে। জেলা ও উপজেলায় অবস্থিত ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেলে যোগাযোগের নম্বর সংযুক্তি-৫ হিসেবে যোগ করা হলো।

অধ্যায়-৭

পরিবার পরিকল্পনা, মাসিক নিয়মিতকরণ, জরুরি গর্ভনিরোধক বড়ি এবং গর্ভপাত পরবর্তী সেবা

পরিবার পরিকল্পনা, মাসিক নিয়মিতকরণ, জরুরি গর্ভনিরোধক বড়ি এবং গর্ভপাত পরবর্তী সেবা

"একটা কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, প্রত্যেক বৎসর আমাদের ৩০ লক্ষ লোক বাড়ে। আমার জায়গা হল ৫৫ হাজার বর্গমাইল। যদি আমাদের প্রত্যেক বৎসর ৩০ লক্ষ লোক বাড়ে তাহলে ২৫-৩০ বৎসরে বাংলার কোনো জমি থাকবে না হাল চাষ করার জন্য..... । সে জন্য আমাদের পপুলেশন কন্ট্রোল, ফ্যামিলি প্ল্যানিং করতে হবে।"

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৭ মার্চ ১৯২০-১৫ আগস্ট ১৯৭৫)

পরিবার পরিকল্পনা

সাধারণ অর্থে পরিবার পরিকল্পনা বলতে জন্মনিয়ন্ত্রণ বুঝানো হয়ে থাকে। প্রকৃত অর্থে পরিবার পরিকল্পনার সংজ্ঞা অনেক ব্যাপক। একটি পরিবারের সার্বিক কল্যাণ ও উন্নতির লক্ষ্যে একটি দম্পতি সচেতনভাবে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে কখন সন্তান নিবেন, কয়টি সন্তান নিবেন এবং কতদিনের বিরতি দিবেন ইত্যাদি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া হলো পরিবার পরিকল্পনা।

অথবা

ব্যক্তিগত, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে কোনো দম্পতি স্বেচ্ছায় কখন এবং কতদিন পর সন্তান নিবেন সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া হলো পরিবার পরিকল্পনা।

পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি

পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি হচ্ছে জন্মরোধমূলক পদ্ধতি যার মাধ্যমে অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণ প্রতিরোধ করা যায়।

খাবার বড়ি | কনডম | ইনজেকশন

পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির গুরুত্ব

- পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি নারীদের গর্ভধারণ রোধ করে পরিবারের সন্তান সংখ্যা সীমিত রাখতে অথবা জন্মবিরতি অর্থাৎ দু'সন্তানের মাঝে প্রয়োজনীয় সময়ের ব্যবধান বজায় রাখতে সহায়তা করে। ফলে সক্ষম দম্পতি তথা জনগণের সন্তান সংখ্যা কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় রাখতে বা জন্মবিরতি পালনে অধিকার অর্জনে সহায়ক হয়।
- নারীদের গর্ভ ও গর্ভসংক্রান্ত ঝুঁকি এড়ানো সম্ভব হয়।
- নারীদের গর্ভপাত তথা অনিরাপদ গর্ভপাতের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পায়।
- পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণে জন্মবিরতিকালে শিশুর নেওয়া যত্ন সহজ হয়, শিশু সুস্থ থাকে এবং শিশুমৃত্যু হ্রাস পায়।
- পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণে কৈশোরকালীন গর্ভধারণ হ্রাস পায়। ফলে, গর্ভবতী কিশোরীদের মাঝে অনিরাপদ গর্ভপাত, অপরিণত বা কম ওজনের শিশু জন্ম এবং নবজাতকের মৃত্যুহার কমে।
- মা ও শিশুর স্বাস্থ্য অটুট থাকে।
- শিশুর মৌলিক চাহিদা নিশ্চিত করে তাকে সুন্দর জীবনে পদার্পণের সুযোগ প্রদান করা যায়।
- অধিক সন্তানের কারণে দম্পতির মানসিক, শারীরিক ও আর্থিক চাপ বৃদ্ধি পায় এবং সুখী সংসার গঠনে বাধাপ্রাপ্ত হয়।
- জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতি হ্রাসকরণে একটি সহায়ক উপাদান হিসেবে কাজ করে। এটি গ্রহণ বা ব্যবহারে দেশের জনসংখ্যা কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় সীমিত রাখা সম্ভব হয় এবং অধিক জনসংখ্যার নেতিবাচক প্রভাব দূর করা যায়, পরিবেশ বান্ধব পরিবার নিশ্চিত হয় এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়নের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

চিত্র: শিশু সুস্থ থাকে এবং শিশু মৃত্যু হ্রাস পায়

চিত্র: পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণে কৈশোরকালীন গর্ভধারণ হ্রাস পায়

চিত্র: মা ও শিশু স্বাস্থ্য অটুট থাকে

চিত্র: শিশুর মৌলিক চাহিদা নিশ্চিত করে তাকে সুন্দর জীবনে পদার্পনের সুযোগ প্রদান করে

চিত্র: আধিক সন্তানের কারণে দম্পতির মানসিক, শারীরিক ও আর্থিক চাপ বৃদ্ধি পায়

চিত্র: পরিবার পরিকল্পনা জনসংখ্যা গতি হ্রাসকরণে একটি সহায়ক উপকরণ হিসেবে কাজ করে

পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি কীভাবে কাজ করে

ক) শুক্রাণু ডিম্বাণুর সাথে মিলনে বাধা প্রদান- কনডম, আইইউডি ইত্যাদি

খ) ডিম্বাশয় থেকে ডিম্বস্ফুটনে বাধা প্রদান- জন্মনিয়ন্ত্রণের খাবার বড়ি

গ) শুক্রাণু বা ডিম্বাণুর চলাচল বন্ধ করা, ফলে শুক্রাণু ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হতে পারে না- নারী বা পুরুষের স্থায়ী পদ্ধতি।

পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির প্রকারভেদ

পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি প্রধানত দুই প্রকার যথা-

ক) অস্থায়ী ও খ) স্থায়ী পদ্ধতি

ক) অস্থায়ী পদ্ধতি দুই ধরনের

স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পদ্ধতি

স্বল্পমেয়াদি পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি

১। খাবার বড়ি - প্রতিদিন একটি করে খেতে হয় (সুখী দ্বিতীয়/তৃতীয় প্রজন্ম, আপন)

২। কনডম - প্রতিবার সহবাসের সময় সঠিকভাবে নিয়মিত ব্যবহার করতে হয়।

৩। ইনজেকশন - (ডিপো-প্রভেরা) তিন মাস অন্তর গ্রহণ করতে হয়।

চিত্র: খাবার বড়ি

চিত্র: কনডম

চিত্র: ইনজেকশন

দীর্ঘমেয়াদি পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতিঃ (LARC- Long Acting Reversible Contraceptives)

- আইইউডি- কপার টি ৩৮০এ ১০ বছর মেয়াদি
- ইমপ্ল্যান্ট - ৩ অথবা ৫ বছর মেয়াদি

চিত্র: আইইউডি- কপার টি

চিত্র: ইমপ্ল্যান্ট

খ) স্থায়ী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি (LAPM: Long Acting Permanent Methods)

এগুলো আবার দুই ধরনের- নারীদের জন্য ও পুরুষের জন্য

সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী সক্ষম দম্পতির যেকোনো একজনের অপারেশনের মাধ্যমে স্থায়ীভাবে সন্তান জন্মদানের প্রক্রিয়া বন্ধ করা হয়। স্থায়ী পদ্ধতি আবার দুই প্রকার, যথা-

ক) নারীর জন্য স্থায়ী পদ্ধতি - টিউবেকটমি

খ) পুরুষের জন্য স্থায়ী পদ্ধতি - ভ্যাসেকটমি/এনএসভি। জন্মনিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি বাছাইকরণ

পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতিসমূহ

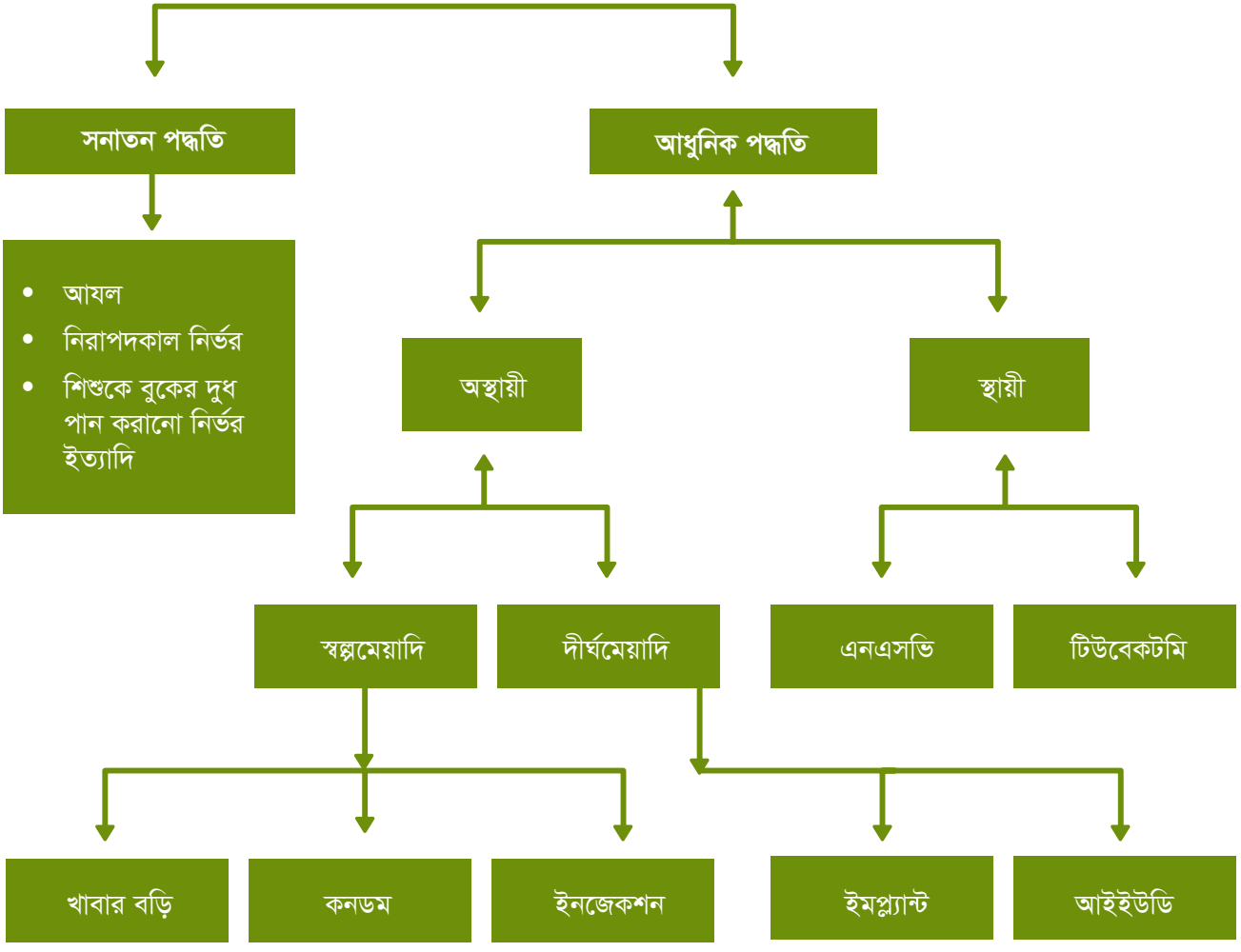

জন্মনিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি বাছাইকরণ

সব পদ্ধতি প্রজনন সক্ষম সকল স্বামী-স্ত্রীর জন্য সমানভাবে উপযোগী নয়। কোন পদ্ধতি কার জন্য উপযুক্ত তা নিচের ছক অনুযায়ী গ্রহীতার অবস্থা এবং তার চাহিদা অনুসারে বেছে নিতে পারেন:

গ্রহীতা	অবস্থান	পদ্ধতি
নবদম্পতি	নববিবাহিত স্বামী-স্ত্রী, ২-৩ বছর দেরি করে সন্তান নেওয়ার জন্য (২০ বছর বয়সের আগে সন্তান নিলে মা ও শিশুর মৃত্যুর ঝুঁকি থাকে)।	খাবার বড়ি, কনডম, ইমপ্ল্যান্ট
যাদের একটি সন্তান আছে	প্রথম সন্তান জন্মের পর ৩-৪ বছর পর্যন্ত সন্তান না নেওয়ার জন্য (দুই সন্তানের জন্মের মধ্যে ব্যবধান ৩ বছরের বেশি হলে শিশুমৃত্যুর ঝুঁকি প্রায় ৫০ ভাগ কমে যায়)।	ইনজেকশন, আইইউডি, ইমপ্ল্যান্ট, কনডম, খাবার বড়ি
যাদের দু'টি সন্তান আছে (স্থায়ী পদ্ধতির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন)	পরিবারকে দুই সন্তানেই সীমিত রাখার জন্য (৩৫ বছরের পর গর্ভধারণ না করলে এবং ২টির অধিক সন্তান না নিলে মা ও শিশুমৃত্যুর ঝুঁকি কমে যায়)।	আইইউডি, ইমপ্ল্যান্ট, ইনজেকশন, খাবার বড়ি, কনডম
যাদের একাধিক সন্তান আছে, ভবিষ্যতে আর কোন সন্তান চান না	দু'টি সন্তান থাকলে ছোট সন্তানের বয়স কমপক্ষে দুই বছর হতে হবে। দু'টির বেশি সন্তান থাকলে ছোট সন্তানের যেকোনো বয়সে দম্পতির যেকোনো একজন বন্ধ্যাকরণ পদ্ধতি বেছে নিতে পারেন।	ভ্যাসেকটমি/এনএসভি (পুরুষ বন্ধ্যাকরণ) টিউবেকটমি (মহিলা বন্ধ্যাকরণ)

গ্রহীতার শারীরিক কোন অবস্থায় কোন পদ্ধতি ব্যবহার করা উচিত নয়

গ্রহীতার শারীরিক অবস্থা	যে পদ্ধতি ব্যবহার উপযোগী নয়
৩৫ বছরের বেশি বয়সী ধুমপায়ী নারী	খাবার বড়ি
উচ্চ রক্তচাপ	খাবার বড়ি, ডিএমপিএ ইনজেকশন
শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানোর প্রথম ৬ সপ্তাহ	ডিএমপিএ ইনজেকশন, ইমপ্ল্যান্ট, প্রজেস্টেরন খাবার বড়ি
শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানোর প্রথম ৬ মাস	ডিএমপিএ ইনজেকশন, ইমপ্ল্যান্ট, প্রজেস্টেরন খাবার বড়ি
গুরুতর হৃদরোগ ও রক্তনালীর রোগ এবং সক্রিয় লিভার রোগ	ডিএমপিএ ইনজেকশন, ইমপ্ল্যান্ট, খাবার বড়ি। এক্ষেত্রে কনডম ব্যবহার করা ভালো।
বর্তমানে বা গত তিন মাসে যদি যৌনবাহিত রোগ সংক্রমণ হয়ে থাকে, যৌনবাহিত রোগের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হলে (যেমনঃ যৌন সঙ্গীর যদি অন্য আরও যৌন সঙ্গী থাকে)	আইইউডি। (বিস্তারিত জানার জন্য দক্ষ সেবাপ্রদানকারীকে জিজ্ঞাসা করুন)।
স্ত্রী প্রজননতন্ত্রের কিছু অস্বাভাবিক রোগ	প্রজেস্টেরন খাবার বড়ি ডিএমপিএ ইনজেকশন, ইমপ্ল্যান্ট, আইইউডি।
কোনো নারীকে গর্ভবতী মনে হলে	কোনো পদ্ধতি দেওয়া যাবে না।
স্তনে চাকা, দলা এবং পায়ের শিরা ফুলে যাওয়া	কোনো হরমোনাল পদ্ধতি দেওয়া যাবে না।

গর্ভনিরোধক খাবার বড়ি (সুখী ও আপন)

গর্ভনিরোধক খাবার বড়ি সর্ম্পকিত মৌলিক ধারণা

খাবার বড়ি বহুল প্রচলিত একটি জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি। গর্ভনিরোধক হিসাবে খাবার বড়ি অত্যন্ত নিরাপদ ও কার্যকর পদ্ধতি। পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমে ইস্ট্রোজেন ও প্রজেস্টেরন সমৃদ্ধ মিশ্র খাবার বড়ি (সুখী) এবং শুধুমাত্র প্রজেস্টেরন সমৃদ্ধ গর্ভনিরোধক খাবার বড়ি (আপন) প্রচলিত আছে।

খাবার বড়ির ধরন		হরমোনের মাত্রা
১. মিশ্র খাবার বড়ি (Combined oral contraceptive pill) প্রতিটি বড়িতে একই মাত্রায় ইস্ট্রোজেন ও প্রজেস্টেরন থাকে।	স্বল্প মাত্রার মিশ্র খাবার বড়ি (Low dose pill) কর্মসূচিতে চালু আছে "সুখী" নামে	ইথিনাইল ইস্ট্রাডিয়ল-৩০ মাইক্রোগ্রাম লেভোনরজিস্ট্রিল-১৫০ মাইক্রোগ্রাম
২. শুধুমাত্র প্রজেস্টেরন সমৃদ্ধ জন্মবিরতিকরণ খাবার বড়ি। প্রতিটি বড়িতে একই মাত্রায় প্রজেস্টেরন থাকে।	শুধুমাত্র প্রজেস্টেরন সমৃদ্ধ খাবার বড়ি (Progesterone only pill-POP) কর্মসূচিতে চালু আছে "আপন" নামে	০.০৭৫ মিলিগ্রাম নরজেস্ট্রিল

গর্ভনিরোধক মিশ্র খাবার বড়ি

গর্ভনিরোধক মিশ্র খাবার বড়ি অত্যন্ত নিরাপদ ও কার্যকর পদ্ধতি। বাংলাদেশে মিশ্র খাবার বড়িই হলো সর্বাধিক (২৭%) ব্যবহৃত অস্থায়ী স্বল্প মেয়াদি জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি। গর্ভনিরোধক মিশ্র খাবার বড়ি কর্মসূচিতে "সুখী" নামে চালু আছে।

কীভাবে কাজ করে

- ডিম্বস্ফুটনে (Ovulation) বাধা দেয়;
- জরায়ুর মুখের (Cervix) শ্লেষ্মাকে ঘন এবং চটচটে করে শুক্রকীটকে জরায়ুতে প্রবেশে বাধা দেয়;
- জরায়ুর ভিতরের ঝিল্লির বৃদ্ধি করে, ফলে নিষিক্ত ডিম্বানু (যদি নিষিক্ত হয়) জরায়ুতে গ্রথিত হবার মতো কোনো পরিবেশ পায় না এবং গ্রথিত হতে পারে না;
- ডিম্ববাহী নালীর (ফ্যালোপিয়ান টিউব) স্বাভাবিক নড়াচড়ার গতি কমিয়ে দেয়, ফলে শুক্রকীটগুলোর গতিও কমে যায়। ডিম্বের কাছে পৌঁছাতে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি সময় লেগে যায় এবং দূর্বল হয়ে পড়ে বা মারা যায়।

বড়ি যাদের জন্য উপযুক্ত

- সকল ১৫-৪৯ বয়সী সক্ষম দম্পতি (ধূমপান করেন, জর্দা খান এবং যাদের বয়স ৩৫ বছরের বেশি, তারা ছাড়া);
- যারা জন্মনিয়ন্ত্রণে অত্যন্ত কার্যকর একটি অস্থায়ী পদ্ধতি নিতে চান;
- মাসিকের সময় অতিরিক্ত রক্তস্রাবের কারণে যারা রক্তস্বল্পতায় ভোগেন;
- মাসিকের সময় যাদের তলপেটে তীব্র মোচড়ানো ব্যথা হয়;
- মাসিক চক্র যাদের অনিয়মিত;
- যেসব মা সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছেন তাদের সন্তানের বয়স ৬ মাস হওয়ার পর;
- বাছাইকরণ চেকলিস্ট উত্তীর্ণ সকল দম্পতি।

মিশ্র খাবার বড়ি (সুখী) পদ্ধতি বাছাইকরণ চেকলিস্ট

গ্রহীতা নারীকে নিচের প্রশ্নগুলো করুন। সব কয়টি প্রশ্নের উত্তর "না" হলে পদ্ধতি দেওয়া যাবে, কোন একটি প্রশ্নের উত্তর "হ্যাঁ" হলে পদ্ধতি দেওয়া যাবে না। এক্ষেত্রে গ্রহীতাকে বিস্তারিত পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা/চিকিৎসকের নিকট প্রেরণ করতে হবে।

মিশ্র খাবার বড়ি (সুখী) পদ্ধতি বাছাইয়ের ক্ষেত্রে প্রশ্নমালা	উত্তর	
	হ্যাঁ	না
আপনার ছোট সন্তানের বয়স কি ছয় সপ্তাহের কম? এবং আপনার ছোট সন্তান কি শুধু মাত্র বুকের দুধ খায়?		
আপনি কি মনে করেন আপনার পেটে সন্তান এসেছে অথবা আপনার কি ৪ সপ্তাহের বেশি মাসিক বন্ধ আছে?		
আপনার কি ঘন ঘন খুব বেশি মাথা ব্যথা হয় ও চোখে ঝাপসা দেখেন? (মাইগ্রেন এবং চোখে অলৌকিক ঝলকানি দেখা)		
আপনি কি উচ্চ রক্তচাপে (রক্তচাপ ১৪০/৯০ মি মি পারদ বা তার বেশি) ভুগছেন?		
আপনি কি ডায়েবেটিস বা বহুমূত্রজনিত জটিলতা রোগে (২০ বছরের অধিক) ভুগছেন?		
আপনার পায়ের শিরা কি ফুলে আছে এবং এগুলো থেকে কি ব্যথা হয়?		

মিশ্র খাবার বড়ি (সুখী) পদ্ধতি বাছাইয়ের ক্ষেত্রে প্রশ্নমালা	উত্তর	
	হ্যাঁ	না
আপনার স্তনে কি শক্ত চাকা/দলা আছে?		
সামান্য কাজ করার পরে কি আপনার বুকে ব্যথা হয় অথবা আপনি কি হাঁপিয়ে ওঠেন? (ইসকেমিক হৃদরোগে আক্রান্ত বা পূর্বে স্ট্রোক হয়ে থাকলে)		
আপনি কি বর্তমানে জন্ডিস (চোখ বা চামড়ার রং হলুদ) রোগে ভুগছেন?		
আপনি কি ধুমপায়ী বা তামাকপাতা/জর্দা সেবন করেন এবং আপনার বয়স কি ৩৫ বছরের বেশি?		
দুই মাসিকের মাঝামাঝি সময়ে বা সহবাসের পর আপনার কি রক্ত যায়?		
আপনি কি যক্ষা রোগের ঔষধ (রিফামপিসিন) বা মৃগী রোগের ঔষধ (ফেনিটয়েন) সেবন করেন?		

খাবার বড়ির সুবিধা

- সঠিকভাবে খেলে এটি অত্যন্ত কার্যকর ও নিরাপদ পদ্ধতি;
- প্রজননক্ষম সকল বয়সী নারী এটি খেতে পারেন;
- এটি একটি অস্থায়ী পদ্ধতি, যেকোনো সময়ে বড়ি ছেড়ে দিয়ে অন্য পদ্ধতি গ্রহণ করা যায় অথবা গর্ভধারণ করা যায়;
- জরায়ুর বাইরে গর্ভধারণের ঝুঁকি কমায়;
- মাসিকের সময় জরায়ুর মোচড়ানো ব্যথা কমায়;
- মাসিক স্রাবের সময়কাল ও পরিমাণ কমায় এবং রক্তস্বল্পতা দূর করতে সহায়তা করে;
- মাসিক চক্রকে নিয়মিত করে;
- এন্ড্রোমেট্রিওসিস-এর প্রকোপ কমায় এবং এর চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়;
- মাসিক পূর্ববর্তী উপসর্গ যেমন শরীর ব্যথা, ম্যাজম্যাজ ভাব, মাথা ব্যথা, বিষন্নতা, শরীরে পানির আধিক্য ইত্যাদি কমায়;
- ডিম্বাশয়ের সিস্ট হওয়ার ঝুঁকি কমায়;
- ব্রণ, অনাকাঙ্ক্ষিত লোম ওঠা কমায়;
- Dysfunctional Uterine Bleeding (DUB) -এর অবস্থার উন্নতি করে।

খাবার বড়ির অসুবিধা

- প্রতিদিন খেতে হয় যৌন রোগ/(HIV and AIDS, RTI/STI) প্রতিরোধ করে না;
- মাসিক স্রাব বন্ধ থাকতে পারে;
- যোনিপথের পিচ্ছিলতা কমে যেতে পারে;
- বুকের দুধ কমে যেতে পারে;
- বিমর্ষতা দেখা দিতে পারে;
- জন্মনিয়ন্ত্রণের খাবার বড়ি ব্যবহারের প্রথম দিকে (বিশেষত ৩ থেকে ৪ মাসের মধ্যে) ছোট খাট পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। যেমন:
  - স্তন স্পর্শকালে ব্যথার অনুভূতি (Tenderness);
  - দুই মাসিকের মধ্যবর্তীকালে ফোঁটা ফোঁটা রক্তস্রাব;
  - বমি বমি ভাব;
  - মাথা ধরা;
  - মুখে ব্রণ;
  - ওজন বৃদ্ধি
- যেসকল নারীর মায়োকার্ডিয়াল ইনফেকশন (Moycardial infection) -এ আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বিদ্যমান খাবার বড়ি তাদের ঝুঁকি আরো বাড়িয়ে দেয়;
- যেসকল নারীর স্ট্রোক হওয়ার ঝুঁকি আছে যেমন ধূমপান/তামাক পাতা গ্রহণ উচ্চ রক্তচাপ খাবার বড়ি তাদের স্ট্রোকের ঝুঁকি আরো বাড়িয়ে দেয়;
- শিরার রক্ত জমাট বেঁধে যাওয়ার (Venous thromboembolism) সম্ভাবনা বেড়ে যায়। তাই অতীতে বা বর্তমানে যাদের এই সমস্যা হয়েছে তারা ইস্ট্রোজেন সমৃদ্ধ মিশ্র বড়ি খেতে পারবেন না।

মিশ্র খাবার বড়ির ব্যবহার বিধি

- প্রথমবার খাবার বড়ি শুরু করার সময় মাসিকের প্রথম দিন অর্থাৎ মাসিকের প্রথম দিন হতে সাদা বড়ি খাওয়া শুরু করতে হবে (তবে মাসিক শুরুর ১ম দিন থেকে ৫ম দিন পর্যন্ত যেকোনো দিন থেকেও শুরু করা যায়);
- গর্ভবতী নয় নিশ্চিত হলে মাসিকের যেকোনো দিন শুরু করা যায়, তবে পরবর্তী সাতদিন কনডম ব্যবহার করতে হবে;
- যে নারী গর্ভপাত বা এমআর করেছেন বা যে নারীর গর্ভপাত হয়েছে তিনি যদি খাবার বড়ি জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি হিসাবে পছন্দ করেন তবে গর্ভপাত/এমআর করার পর দিন থেকেই বা পরবর্তী ৬ম দিনের মধ্যে বড়ি খাওয়া শুরু করতে হবে;
- খাবার বড়ি পানি দিয়ে গিলে খেতে হয়। প্রতিদিন একই সময় বড়ি খাওয়ার অভ্যাস করা ভালো। বড়ি খাওয়ার সবচেয়ে ভালো সময় হচ্ছে রাতের খাবারের পর বা শোয়ার আগে;
- সাদা বড়ি শেষ হয়ে যাওয়ার পর একইভাবে প্রতিদিন ১টি করে ৭দিনে ৭টি খয়েরি বড়ি খেতে হবে। খয়েরি বড়ি খাওয়াকালীন সাধারণত মাসিক শুরু হয়। মাসিক শুরু হলেও খয়েরি বড়ি খাওয়া বন্ধ করা যাবে না;
- মাসিক হোক বা না হোক ৭টি খয়েরি বড়ি শেষ হওয়ার পরদিন থেকেই উপরের নিয়ম অনুযায়ী নতুন একটি পাতা থেকে নির্দেশনা অনুযায়ী সাদা বড়ি প্রতিদিন খেতে হবে।

মিশ্র খাবার বড়ি খেতে ভুলে গেলে করণীয়ঃ

১. যদি একদিন বড়ি (হরমোন যুক্ত সাদা বড়ি) খেতে ভুলে যান তাহলে যখনই মনে পড়বে তখনই একটি বড়ি খাবেন এবং ঐদিনের বড়িটি যথা সময়ে খাবেন।

২. পর পর দুইদিন খাবার বড়ি (হরমোন যুক্ত সাদা বড়ি) খেতে ভুলে গেলে মনে পড়ার সাথে সাথে একটি বড়ি খাবেন এবং ঐদিনের বড়িটি যথা সময়ে খাবেন। পাতার অবশিষ্ট বড়ি নিয়মিতভাবে খাবেন এবং পরবর্তী ৭দিন প্রয়োজনে কনডম ব্যবহার করবেন অথবা স্বামী সহবাস থেকে বিরত থাকবেন। উল্লিখিত ৭দিনের মধ্যে কনডম ছাড়া সহবাস করলে জরুরি গর্ভনিরোধক বড়ি খাবেন। অন্যথায় জন্মনিয়ন্ত্রণের সুরক্ষা পাওয়া যাবে না।

৩. যদি পর পর তিনদিন বড়ি খেতে ভুলে যান তবে ঐ পাতা থেকে বড়ি খাবেন না এবং পরবর্তী মাসিকের আগ পর্যন্ত কনডম ব্যবহার করবেন বা সহবাস থেকে বিরত থাকবেন।

মিশ্র খাবার বড়ির (সুখী) পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া ও জটিলতার ব্যবস্থাপনা

সমস্যা	যা অনুসন্ধান করতে হবে	ব্যবস্থাপনা/সমাধান
১. মাসিক স্রাব বন্ধ	• গ্রহীতাকে জিজ্ঞেস করতে হবে খাবার বড়ি খাওয়া বন্ধ করেছে কিনা বা বড়ি খেতে ভুলে গেছে কিনা। বড়ি খেতে ভুলে গেলে গর্ভধারণের সম্ভবনা বৃদ্ধি পায়। গ্রহীতা গর্ভবতী কিনা তা প্রয়োজনীয় প্রশ্ন করে, লক্ষণ দেখে এবং শারীরিক পরীক্ষার সাহায্যে নির্ধারণ করতে হবে। • এমন কোন ঔষধ খান কিনা যা খাবার বড়ির ইস্ট্রোজেনকে লিভারের মাধ্যমে সহজে বিপাকৃত করে। যেমন Rifampicin, phenytion, arbamazinpin, berbiturate, primidon ফলে গর্ভধারণের সম্ভাবনা থাকে।	• প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে নিয়মিতভাবে বড়ি খাওয়ার পরামর্শ দিন এবং বড়ি খেতে ভুলে গেলে কি নিয়মে বড়ি খেতে হবে তা ভালোভাবে বুঝিয়ে দিন। • গর্ভবতী হলে বড়ি খেতে নিষেধ করতে হবে এবং প্রসবপূর্ব যত্নের জন্য ক্লিনিকে পাঠাতে হবে। গর্ভবতী না হলে বুঝিয়ে বলতে হবে যে, জরায়ুর দেয়ালের ভেতরের আবরণ তৈরি না হওয়ার জন্য মাসিক হচ্ছে না। • সঠিক নিয়মে খাবার বড়ি খেয়ে থাকলে গ্রহীতাকে আশ্বস্ত করতে হবে এতে উদ্বেগের কিছু নেই। এরপরও গ্রহীতা আশ্বস্ত না হলে তাকে স্বল্পমাত্রার বদলে তিন চক্র সাধারণ মাত্রার বড়ি ব্যবহারের পরামর্শ দিতে হবে। • নিশ্চিত হতে হবে যে, গ্রহীতা গর্ভবতী নয়। গর্ভবতী না হলে বুঝতে হবে যে, মিশ্র বড়ি খাওয়ার আগে মাসিক অনিয়মিত থেকে থাকলে, বড়ি খাওয়া বন্ধ করলে আবার মাসিক অনিয়মিত হবে। এমনকি তা ফিরে আসতে কয়েক মাস লাগতে পারে। গ্রহীতা চাইলে তাকে অন্য একটি পদ্ধতি গ্রহণ করতে সাহায্য করতে হবে। • গ্রতীতার মাসিক স্রাব বন্ধ থাকার কারণে চিন্তাগ্রস্থ থাকলে তাকে মাসিক হবার জন্য ঔষধ দেওয়া যেতে পারে, যেমন-ট্যাবলেট Normens, Norculate ১টি করে দিনে ৩ বার ৭ দিন। ঔষধ সেবন শেষ হবার ৭ থেকে ১০ দিন পর মাসিক স্রাব শুরু হবার সম্ভাবনা আছে।

সমস্যা	যা অনুসন্ধান করতে হবে	ব্যবস্থাপনা/সমাধান
২. ফোঁটা ফোঁটা রক্তস্রাব (spoting) বা দুই মাসিকের মধ্যবর্তী সময়ে রক্তস্রাব	• গ্রহীতা অল্পদিন আগে বড়ি খাওয়া শুরু করেছেন কিনা • গ্রহীতা ১টি বা তার বেশি বড়ি খেতে ভুলে গেছেন কিনা অথবা একেক দিন একেক সময় বড়ি খান কিনা • গ্রহীতার প্রচন্ড বমি অথবা ডায়রিয়া হয়েছিল কি-না তা জিজ্ঞেস করতে হবে। • পরীক্ষা করে নিশ্চিত হতে হবে যে, গ্রহীতা গর্ভধারণ করেননি বা গর্ভপাত হয়নি এবং টিউমার, যৌনাঙ্গে প্রদাহ বা অন্য কোন স্ত্রীরোগ নেই। • উপরের কোনটি নয়	• গ্রহীতাকে আশ্বস্ত করতে হবে যে, খাবার বড়ি শুরু করার প্রথম তিন চার মাস পর্যন্ত ফোঁটা ফোঁটা রক্তস্রাব হওয়া অস্বাভাবিক নয়। • হ্যাঁ হলে, মাসিক চক্রের মাঝখানে রক্তস্রাবের সম্ভাবনা কমানোর জন্য প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে বড়ি খাবার পরামর্শ দিন। বড়ি খেতে ভুলে গেলে কয়টি বড়ি খেতে ভুলে গেছে তা জেনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা দিন এবং কি নিয়মে বড়ি খেতে হবে তা ভালভাবে বুঝিয়ে দিন। • বমি বা ডায়ারিয়া হয়ে থাকলে আশ্বস্ত করতে হবে যে, সে জন্য রক্তে বড়ির কার্যকর মাত্রা অর্জিত হয়নি। গ্রহীতাকে বমি এবং ডায়ারিয়া না সারা পর্যন্ত বড়ির পাশাপাশি কনডম ব্যবহার করার পরামর্শ দিতে হবে। তবে পরবর্তী মাসিক না হওয়া পর্যন্ত কনডম ব্যবহার করা ভালো। • স্ত্রীরোগজনিত সমস্যা থাকলে পরামর্শের জন্য চিকিৎসকের নিকট পাঠাতে হবে। • যদি কোন স্ত্রীরোগ, পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া বা অন্যান্য কোন কারণ সনাক্ত করা না যায় তা হলে ধরে নিতে হবে যে, জরায়ুর ভেতরর দেয়ালের আবরণ অপর্যাপ্ত হবার কারণে এমনটি হচ্ছে। এক্ষেত্রে গ্রহীতাকে অধিক প্রজেস্টেরন সমৃদ্ধ (নরজেসট্রিল বা লেভোনরজেসট্রিল) বড়ি খাবার পরামর্শ দিতে হবে। • গ্রহীতা যদি তা খেতে থাকেন তাহলে তাকে কয়েক চক্রের জন্য স্বল্পমাত্রার বদলে সাধারণ মাত্রার (৫০ মাইক্রোগ্রাম ইস্ট্রোজেন) খাবার বড়ি ব্যবহার করার পরামর্শ দিতে হবে। তারপর ফোঁটা ফোঁটা রক্তস্রাব স্বাভাবিক হয়ে গেলে আবার স্বল্পমাত্রার বড়িতে ফিরে আসা যাবে। যদি আবারো এরকম লক্ষণ দেখা দেয় তাহলে গ্রহীতাকে সাধারণ মাত্রার খাবার বড়িই খাবার পরামর্শ দিতে হবে। • অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ মাত্রার খাবার বড়িতে এরকম হলে প্রতিদিনের নিয়মিত বড়ির সঙ্গে আরো একটি করে বড়ি রক্তস্রাব বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত খেয়ে যেতে বলতে হবে। সেক্ষেত্রে গ্রহীতা যাতে অবশ্যই ধূমপান বা তামাক পাতা/ জর্দা গ্রহণ না করেন সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

সমস্যা	যা অনুসন্ধান করতে হবে	ব্যবস্থাপনা/সমাধান
৩. বমি বমি ভাব	• মহিলা গর্ভবতী কিনা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। • গ্রহীতা সকালে অথবা খালি পেটে খাবার বড়ি খায় কিনা তা বিবেচনা করতে হবে। • বমি বমি ভাবের অন্য কোন কারণ আছে কিনা তা বিবেচনা করতে হবে। • উপরের কোন কারণই বমি বমি ভাবের জন্য দায়ী নয়	• গর্ভবতী হলে বড়ি খাওয়া বন্ধ করে গর্ভকালীন যত্নের জন্য সেবা কেন্দ্রে প্রেরণ করতে হবে। • বমি বমি ভাব কমাতে হলে রাতের খাবার সাথে বড়ি খেতে হবে। সাধারণতঃ বড়ি ব্যবহারের প্রথম কয়েক মাসের মধ্যেই বমি বমি ভাব কমে যায়। • রোগ সংক্রমণ (পিত্তথলির সংক্রমণ, হেপাটাইটিস, গ্যাস্ট্রোএন্টেরাইটিস) হয়েছে কি-না পর্যালোচনা করতে হবে। • এ পদ্ধতি পরিবর্তন করে গ্রহীতার জন্য উপযোগী অন্য কোন পদ্ধতি গ্রহণ করতে সাহায্য করতে হবে।
৪. মাথা ধরা বা ব্যথা	• গ্রহীতার নাক দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়ে কিনা বা সাইনুসাইটিসের সমস্যা আছে কিনা নির্ধারণ করতে হবে। • গ্রহীতাকে জিজ্ঞেস করতে হবে তার কখনো উচ্চ রক্তচাপ ছিল কিনা। • পেশী সংকোচন এবং মাইগ্রেন জনিত মাথা ব্যথা সনাক্ত করার চেষ্টা করতে হবে। পেশী সংকোচনজনিত মাথা ব্যথা সাধারণতঃ মাথার সামনে বা ভিতরের দিকে হয়, দুইপাশে সমানভাবে তা অনুভূত হয়। অন্যদিকে মাইগ্রেন মৃদু থেকে মারাত্মক হতে পারে। কপালের পাশে তীব্র ব্যথা হতে পারে এবং বমি বা বমি বমি ভাব হতে পারে। রোগী মাথা ব্যথা যে হবে তা টের পান। কোন কোন রোগী স্নায়ুবিক উপসর্গে ভোগেন, যেমন-দৃষ্টি সমস্যা, ঝলকানো আলো, সব জিনিস দুটো করে দেখা বা দেখতে না পাওয়া ▪ হাত-পা অবশ বোধ করা ▪ কথা বলা বা স্মৃতি শক্তির সমস্যা • গ্রতীতাকে জিজ্ঞেস করতে হবে, তার বড়ি খাওয়া শুরু করার পর থেকে মাথা ধরা বেড়েছে কিনা।	• সাইনুসাইটিস থাকলে চিকিৎসা দিতে হবে। • উচ্চ রক্তচাপের ইতিহাস থাক বা না থাক রক্তচাপ পরীক্ষা করতে হবে। রক্তচাপ বেশি হলে "উচ্চ রক্তচাপ" অনুচ্ছেদে উল্লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করতে হবে। • স্নায়ুবিক উপসর্গ উপস্থিত থাকলে নিশ্চিত হবে যে এটি মাইগ্রেন জনিত ব্যথা। গ্রহীতার স্ট্রোক হবার ঝুঁকি বিদ্যমান। অবশ্যই ধূমপান বা তামাক পাতা সেবন না করার পরামর্শ দিতে হবে। মাইগ্রেন থাকলে (উপসর্গ সহ বা ছাড়া) খাবার বড়িসহ যে কোন হরমোনাল পদ্ধতি বন্ধ করতে হবে। যদি মাইগ্রেন না হয় তবে খাবার বড়ি চালিয়ে যেতে হবে এবং মাথা ব্যথার চিকিৎসা করতে হবে। • মাথা ধরা বেড়ে থাকলে মহিলার যদি উচ্চ রক্তচাপ বা স্নায়বিক উপসর্গ থাকে তবে এ পদ্ধতি পরিবর্তন করে অন্য কোন হরমোন বিহীন পদ্ধতি দিতে হবে।

সমস্যা	যা অনুসন্ধান করতে হবে	ব্যবস্থাপনা/সমাধান
৫. উচ্চ রক্তচাপ	• যদি রক্তচাপ ১৪০/৯০ মি.মি পারদের নিচে হয় • যদি রক্তচাপ ১৪০/৯০ মি. মি. পারদ বা তার বেশি হয়	• খাবার বড়ি চালিয়ে যেতে পারে। • খাবার বড়ি বাদ দিতে হবে।
৬. স্তন ভারি বোধ হওয়া এবং স্পর্শকালে স্তনে বেদনার অনুভূতি	• গর্ভধারণের ইতিহাস গ্রহণের মাধ্যমে এবং প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধা ব্যবহার করে নির্ধারণ করতে হবে গ্রহীতা গর্ভবতী কিনা। • গ্রহীতার স্তনে চাকা অথবা বোঁটা থেকে পুঁজ বের হচ্ছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। এ রকম হলে ক্যান্সার হওয়ার সন্দেহ থাকে। • যদি গ্রহীতা বুকের দুধ খাওয়ান এবং স্তনে স্পর্শকালে বেদনার অনুভূতি থাকে, তাহলে পরীক্ষা করে দেখতে হবে স্তনে সংক্রমণ হয়েছে কিনা।	• মহিলা গর্ভবতী হলে বড়ি ব্যবহার বন্ধ করে গর্ভকালীন যত্নের জন্য সেবাকেন্দ্রে পাঠাতে হবে। যদি গর্ভধারণের কারণে না হয়ে থাকে, তাহলে সাধারণত বড়ি শুরু করার তিন-চার মাসের মধ্যে তা কমে যায়। • শারীরিক পরীক্ষায় যদি স্তনে চাকা বা পুঁজ নিঃসরণ থেকে ক্যান্সারের সন্দেহ হয় তাহলে বড়ি বন্ধ করে তাকে অন্য কোন নন হরমোনাল পদ্ধতি পছন্দ করতে সাহায্য করতে হবে। তাকে চিকিৎসকের নিকট পাঠাতে হবে। • স্তনে জীবাণু সংক্রমণ না থাকলে স্তন স্বাভাবিক রাখার জন্য উপযুক্ত পোশাকের পরামর্শ দিতে হবে। স্তনে প্রদাহ থাকলে হালকা গরম সেক দিতে হবে এবং স্তন্যদান চালিয়ে যেতে বলতে হবে। সংক্রমণ হয়ে থাকলে চিকিৎসকের নিকট পাঠাতে হবে।
৭. বিমর্ষতা	• গ্রহীতাকে বিমর্ষতার কারণ জিজ্ঞেস করতে হবে। পারিবারিক, আর্থিক বা সামাজিক কারণের জন্য বিমর্ষতা হতে পারে। • অন্য কোন কারণ না পাওয়া গেলে, জিজ্ঞেস করতে হবে জন্মনিয়ন্ত্রণের মিশ্র খাবার বড়ি খাওয়ার পর থেকে বিমর্ষতা বেড়েছে কিনা।	• গ্রহীতাকে উপযুক্ত খাদ্য, পুষ্টি এবং ব্যায়াম সম্পর্কে পরামর্শ দিতে হবে। • মিশ্র খাবার বড়ি খাওয়ার পর থেকে যদি বিমর্ষতা বেড়ে থাকে, তাহলে তাকে হরমোন ছাড়া অন্য পদ্ধতি গ্রহণ করতে সাহায্য করতে হবে। যদি মিশ্র বড়ি খাওয়ার কারণে বিমর্ষতা না বেড়ে থাকে, তাহলে বড়ি চালিয়ে যাওয়া যায়।
৮. অনাকাঙ্ক্ষিত ওজন বৃদ্ধি বা হ্রাস	• গ্রহীতার খাদ্যাভাস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে হবে। অপরিমিত খাদ্য গ্রহণের ফলে ওজনের হ্রাস/বৃদ্ধি ঘটতে পারে। • খাদ্যাভাস টিক থাকা সত্ত্বেও যদি রুচি ও ওজন বৃদ্ধির অভিযোগ হয় তাহলে এই বর্ধিত ওজন তার কাছে অনাকাঙ্ক্ষিত কিনা তা জিজ্ঞেস করতে হবে।	গ্রহীতাকে উপযুক্ত খাদ্য, পুষ্টি এবং ব্যায়াম সম্পর্কে পরামর্শ দিতে হবে। গ্রহীতাকে আশ্বস্ত করতে হবে যে, সকল হরমোন নির্ভর জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিরই ওজনের উপর কিছুটা প্রভাব রয়েছে। তবে মিশ্র খাবার বড়িতে যে মাত্রায় হরমোন নগণ্য। এরপরও যদি দেখা যায় যে, মিশ্র বড়ি খাওয়ার পর অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে ওজন বৃদ্ধি হয়েছে তাহলে মহিলাকে হরমোন ছাড়া অন্য কোন পদ্ধতি গ্রহণে সাহায্য করতে হবে।

সমস্যা	যা অনুসন্ধান করতে হবে	ব্যবস্থাপনা/সমাধান
৯. কোয়াজমা বা গর্ভবস্থার মধ্যে মুখের ত্বকের রঙের পরিবর্তন	• অন্যান্য কারণ অনুসন্ধান করতে হবে যেমন গর্ভাবস্থা, কড়া রোদে থাকা, পারদ মিশ্রিত ক্রীম ব্যবহার করা • রিং ওয়ার্ম বা অন্য কোন চর্ম রোগ থাকা। • কোন কারণ পাওয়া না গেলে এবং অবস্থার উন্নতি না হলে।	• ক্রীম না মাখতে বা কড়া রোদে না যেতে পরামর্শ দিতে হবে। সম্প্রতিক গর্ভাবস্থার ইতিহাস থাকলে তিন মাস অপেক্ষা করার পরামর্শ দিতে হবে। • উপযুক্ত চিকিৎসার জন্য রেফার করতে হবে। • কোন কারণ পাওয়া না গেলে এবং মুখের ত্বকের রং এর পরিবর্তন গ্রহীতার কাছে অসহনীয় হলে এবং তা খাবার বড়ির সাথে সম্পৃক্ত হলে গ্রহীতাকে অন্য একটি পদ্ধতি বেছে নিতে সাহায্য করতে হবে।
১০. ব্রণ	• গ্রহীতাকে জিজ্ঞেস করতে হবে তিনি কয়বার মুখ ধুয়ে থাকেন। • গ্রহীতাকে জিজ্ঞেস করতে হবে, বর্তমানে তিনি শারীরিক বা মানসিক চাপের মধ্যে আছেন কিনা	• তাকে দিনে দুইবার লেবুর রস মিশ্রিত পানি দিয়ে মুখ ধুতে বলতে হবে এবং মুখে তেল বা ক্রীম মাখতে নিষেধ করতে হবে এবং বেশি করে পানি খেতে বলতে হবে এবং নিয়মিতভাবে হাতের নখ কাটতে পরামর্শ দিতে হবে। • থাকলে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিতে হবে। নিয়মিতভাবে হাতের নখ কাটতে পরামর্শ দিতে হবে।

প্রজেস্টেরণ সমৃদ্ধ গর্ভনিরোধক খাবার বড়ি

ভূমিকা

প্রসব পরবর্তী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি হিসেবে শুধুমাত্র প্রজেস্টেরণ সমৃদ্ধ গর্ভনিরোধক খাবার বড়ি পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিতে "আপন" নামকরণ করা হয়েছে এবং পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর এটি নিয়মিত কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করেছে।

প্রজেস্টেরণ সমৃদ্ধ গর্ভনিরোধক খাবার বড়ি

"আপন" নারীদের জন্য একটি কার্যকর অস্থায়ী ও স্বল্পমেয়াদি খাবার বড়ি। এই বড়িতে ০.০৭৫ মিলিগ্রাম প্রজেস্টেরণ হরমোন (নরজেস্ট্রিল) থাকে। এক পাতায় ২৮টি বড়ি থাকে। একটি করে বড়ি প্রতিদিন একই সময়ে খেতে হয়। যেসকল মা সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছেন তাদের জন্য বড়িটি উপযুক্ত। সন্তান প্রসবের পরপরই (৪৮ ঘণ্টার মধ্যে) বড়ি খাওয়া শুরু করতে হবে এবং সন্তানের বয়স ৬ মাস পর্যন্ত বড়ি খেতে পারবেন। তাছাড়া যেসকল নারীর ইস্ট্রোজেন খেলে সমস্যা হয় তারাও এই বড়ি খেতে পারেন। পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমে বড়িটি "আপন" নামে সরবরাহ করা হচ্ছে।

	শ্রেণিবিভাগ	সক্রিয় উপাদান	প্রতি পাতায় বড়ির সংখ্যা
সরকারি কর্মসূচিতে সরবরাহকৃত খাবার বড়ি	**সুখী** (ইস্ট্রোজেন ও প্রজেস্টেরণ সমৃদ্ধ মিশ্র খাবার বড়ি)	লেভোনরজিস্ট্রিল-১৫০ মাইক্রোগ্রাম ইথিনাইল ইস্ট্রাডিয়ল-৩০ মাইক্রোগ্রাম	২৮টি (২১টি হরমোন সমৃদ্ধ ৭টি আয়রন সমৃদ্ধ)
	আপন (শুধুমাত্র প্রজেস্টেরণ সমৃদ্ধ খাবার বড়ি)	নরজেস্ট্রিল ০.০৭৫ মিলিগ্রাম	২৮টি হরমোন সমৃদ্ধ

আপন কীভাবে কাজ করে

- জরায়ুর মুখের শ্লেষ্মাকে ঘন করে শুক্রকীটকে জরায়ুতে প্রবেশে বাধা দেয়।
- ডিম্বস্ফুটনে বাধা দেয়
- জরায়ুর ভিতরের ঝিল্লির বৃদ্ধি করে, ফলে নিষিক্ত ডিম্ব জরায়ুতে গ্রথিত হতে পারে না।

কার্যকারিতাঃ

- প্রজেস্টেরন সমৃদ্ধ গর্ভনিরোধক খাবার বড়ি সঠিক নিয়মে খেলে ৯৭%-৯৮% পর্যন্ত কার্যকর।

গ্রহীতাকে আপন প্রদানের পূর্বে সেবাপ্রদানকারীর করণীয়

আপন প্রদানের পূর্বে গ্রহীতার সাথে আলোচনা করা অত্যাবশ্যক। আলোচনার সময় অন্যান্য সকল পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি সর্ম্পকে গ্রহীতাকে অবহিত করতে হবে যাতে গ্রহীতা তার পছন্দ মত জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বেছে নিতে পারেন। গ্রহীতাকে খাবার বড়ি সম্পর্কে প্রচলিত গুজব ও প্রকৃত তথ্য জানাতে হবে। এছাড়াও গ্রহীতাকে এই পদ্ধতি গ্রহণের সময়, সুবিধা, অসুবিধা, কারা এই পদ্ধতি ব্যবহারের উপযোগী এবং পুনঃগর্ভধারণের ক্ষমতা ফিরে আসার সম্ভাবনা সম্পর্কেও ভালোভাবে বুঝিয়ে বলতে হবে। গ্রহীতা 'আপন' গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিলে সেবাপ্রদানকারী আপন সম্পর্কিত নিম্নলিখিত ধারণাগুলো সঠিকভাবে প্রদান করবেন।

- এই পদ্ধতি কীভাবে কাজ করে
- সম্ভাব্য পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া ও তার সমাধান
- প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে বড়ি খাওয়ার গুরুত্ব
- কোন অবস্থায় জরুরিভিত্তিতে সেবাপ্রদানকারীর সাথে যোগাযোগ করতে হবে
- বড়ি খাওয়া ভুলে গেলে করণীয়
- ছয় মাস পরে পদ্ধতি পরিবর্তনের প্রয়োজনীয় বার্তা দেওয়া

সুবিধা

- সহজলভ্য, নিরাপদ ও কার্যকর
- স্বল্পমাত্রা, অস্থায়ী ও স্বল্পমেয়াদি
- মায়ের বুকের দুধের পরিমাণগত ও গুণগত মান পরিবর্তন হয় না
- সহবাসে বাধার সৃষ্টি করে না
- পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া কম
- ইস্ট্রোজেন সমৃদ্ধ বড়ি খেলে যাদের সমস্যা হয় তারা এই বড়ি খেতে পারেন
- যেকোনো বয়সী নারী এমনকি ৩৫ বছরের উর্ধ্বে এবং ধূমপায়ী/তামাক জাতীয় দ্রব্য সেবনকারী এই পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেন
- মাসিক পূর্ববর্তী উপসর্গ যেমন শরীর ব্যথা, ম্যাজম্যাজ ভাব, মাথা ব্যথা, মন খারাপ হওয়া, শরীরে পানির অধিক্য হওয়া ইত্যাদি কমায়।

অসুবিধা

- প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে খেতে হয়।
- যৌনরোগ প্রতিরোধ করে না
- ফোঁটা ফোঁটা বা অনিয়মিত রক্তস্রাব হতে পারে অথবা মাসিক বন্ধ থাকতে পারে
- যক্ষা রোগের ঔষধ যেমন রিফামপিসিন, মৃগী রোগের ঔষধ যেমন ফেনোবাবিটন, ফেনীটয়েন, কার্বামাজিপাইন ইত্যাদি বড়ির কার্যকারীতা কমায়।

আপন যাদের জন্য উপযুক্তঃ

- বাছাইকরণ চেকলিস্টে উত্তীর্ণ সকল প্রসূতি মা

“আপন” গ্রহীতা বাছাইকরণ চেকলিস্ট

শুধুমাত্র প্রজেস্টেরণ সমৃদ্ধ খাবার বড়ি পদ্ধতি বাছাইয়ের ক্ষেত্রে প্রশ্নমালা	উত্তর	
	হ্যাঁ	না
আপনি কি মনে করেন আপনার পেটে সন্তান এসেছে		
আপনার পায়ের শিরা কি ফুলে আছে এবং এগুলো থেকে কি ব্যথা হয়?		
আপনার স্তনে কি শক্ত চাকা/দলা আছে?		
আপনি কি যক্ষা রোগের ঔষধ (রিফামপিসিন) বা মৃগী রোগের ঔষধ (ফেনিটয়েন) সেবন করেন?		

মনে রাখতে হবে

- প্রতিদিন একই সময়ে একটি করে বড়ি খেতে হবে। নির্দিষ্ট সময় থেকে ৩ ঘণ্টার মধ্যে খেতে হবে। তা না হলে বড়ির কার্যকারিতা কমে যাবে।
- কোনো কারণে স্বামী সাময়িকভাবে বাড়িতে না থাকলে বড়ি খাওয়া বাদ দেওয়া যাবে না।

বড়ি খাওয়ার উপযুক্ত সময়

- সন্তান প্রসবের পরপরই (৪৮ ঘণ্টার মধ্যে) বড়ি খাওয়া শুরু করতে হবে।

বড়ি খাওয়ার নিয়ম

- সন্তান প্রসবের পরপরই (৪৮ ঘণ্টার মধ্যে) বড়ি খাওয়া শুরু করতে হয়। এবং ৬ মাস পর্যন্ত চালিয়ে যেতে হবে।
- প্রতিদিন একই সময়ে ভরা পেটে একটি করে বড়ি খেতে হবে
- প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে বড়িটি সেবন করতে হবে বড়ি খাওয়ার নির্দিষ্ট সময় থেকে ৩ ঘণ্টার বেশি বিলম্ব করা যাবে না। কারণ এতে বড়ির কার্যকারিতা কমে যায়।
- একটি পাতায় ২৮টি হরমোনযুক্ত বড়ি থাকে, সবগুলো বড়ি খাওয়া শেষ হয়ে গেলে পরদিনই নতুন একটি পাতা থেকে বড়ি খাওয়া শুরু করতে হবে। দুই পাতার মাঝে কোনো বিরতি দেওয়া যাবে না। মনে রাখতে হবে বড়ি খাওয়াকালীন কোনো মাসিক হবে না।
- মাসিক হউক বা না হউক গর্ভবতী নন নিশ্চিত হলে মাসিক চক্রের যেকোনো দিন বড়ি শুরু করা যাবে, এক্ষেত্রে প্রথম ৭দিন কনডম ব্যবহার করতে হবে অথবা সহবাস থেকে বিরত থাকতে হবে।
- অন্যান্য জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে গ্রহীতাকে শুধুমাত্র প্রজেস্টেরণ সমৃদ্ধ গর্ভনিরোধক খাবার বড়ি দেওয়া যেতে পারে।

বড়ি খেতে ভুলে গেলে করণীয়

- বড়ি খাওয়ার নির্দিষ্ট সময় থেকে ৩ ঘণ্টার মধ্যে মনে পড়ার সাথে সাথে ভুলে যাওয়া বড়িটি খেতে হবে এবং পরবর্তী বড়িগুলো যথা সময়ে খেতে হবে
- বড়ি খাওয়ার নিদিষ্ট সময় থেকে ৩ ঘণ্টার বেশি বিলম্ব হলে মনে পড়ার সাথে সাথে ভুলে যাওয়া বড়িটি খেতে হবে এবং ঐদিনের বড়িটি যথাসময়ে খেতে হবে। সহবাসের ক্ষেত্রে পরবর্তী দুই দিন কনডম ব্যবহার করতে হবে অথবা সহবাস থেকে বিরত থাকতে হবে।
- একের অধিক বড়ি খেতে ভুলে গেলে মনে পড়ার সাথে সাথে একটি বড়ি খেতে হবে এবং পরবর্তী বড়িগুলো যথাসময়ে খেতে হবে এবং পরবর্তী ৭দিন কনডম ব্যবহার করতে হবে অথবা সহবাস থেকে বিরত থাকতে হবে।

পদ্ধতি পরিবর্তন

- আপন ব্যবহারকারীগণকে প্রসবের ৬ মাস পূর্ণ হলে পদ্ধতি পরিবর্তন করতে হবে।
- আপন পাতার শেষ বড়ি পরদিন থেকে মিশ্র খাবার বড়ি, ইনজেকশন, ইমপ্ল্যান্ট অথবা কপার-টি পদ্ধতি শুরু করতে পারেন তবে পরবর্তী ৭দিন কনডম ব্যবহার করতে হবে অথবা সহবাস থেকে বিরত থাকতে হবে।
- আপন গ্রহণকালীন অথবা আপন শেষ হওয়ার সাথে সাথে কনডম অথবা পুরুষ বা নারী স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারেন

অবস্থা/সমস্যা	যা অনুসন্ধান করতে হবে	
বমি বমি ভাব	১. মহিলা গর্ভবতী কিনা পরীক্ষা করতে হবে। ২. গ্রহীতা সকালে অথবা খালি পেটে বড়ি খায় কিনা? ৩. অন্য কোন কারণ আছে কিনা পরীক্ষা করতে হবে। ৪. কোন কারণ পাওয়া না গেলে।	১. (ক) গর্ভবতী না হলে তাকে এ বিষয়ে আশ্বস্ত করতে হবে যে, ধীরে ধীরে ঠিক হয়ে যাবে। (খ) গর্ভবতী হলে বড়ি খাওয়া বন্ধ করে সেবা কেন্দ্রে যাওয়ার পরামর্শ দিতে হবে। ২. বমি ভাব কমাতে হলে রাতের খাবারের সাথে সাথে বড়ি খেতে পরামর্শ দিতে হবে। ৩. রোগ সংক্রমণ (পিত্তথলির সংক্রমণ, হেপাটাইটিস, গ্যাস্ট্রোএন্ট্রাইটিস) হয়েছে কিনা পর্যালোচনা করতে হবে। ৪. আশ্বস্ত করতে হবে অথবা প্রয়োজনে এ পদ্ধতি পরিবর্তন করার পরামর্শ দিতে হবে।
মাথা ব্যথা	১. গ্রহীতাকে জিজ্ঞেস করতে হবে নাক দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়ে কিনা। ২. গ্রহীতাকে জিজ্ঞেস করতে হবে তার উচ্চ রক্তচাপ আছে কিনা। ৩. গ্রহীতাকে জিজ্ঞেস করতে হবে মাইগ্রেন আছে কিনা	১. সাইনোসাইটিস থাকলে চিকিৎসার পরামর্শ দিতে হবে। ২. রক্ত চাপ পরীক্ষা করতে হবে ১৫৯/৯৯ মি.মি. পারদ এর বেশি হলে বড়ি খাওয়া বন্ধ করতে হবে। ৩. মাইগ্রেন থাকলে খাবার বড়িসহ সকল হরমোনাল পদ্ধতি বন্ধ রাখতে হবে।
মানসিক দুশ্চিন্তা/ অবসাদগ্রস্থতা, ব্রণ	১. গ্রহীতা কোন শারীরিক বা মানসিক চাপে আছেন কিনা। ২. গ্রহীতা দিনে কতবার মুখ ধুয়ে থাকেন।	১. আশ্বস্ত করতে হবে। ২. (ক) বার বার মুখ ধৌত করার পরামর্শ দিতে হবে। তেল বা ক্রীম মাখতে নিষেধ করতে হবে। বেশি করে পানি পান করার এবং নিয়মিত নখ কাটার পরামর্শ দিতে হবে। (খ) বড়ি খাওয়ার পর যদি বেড়ে থাকে তাহলে হরমোন বিহীন পদ্ধতির পরামর্শ দিতে হবে।

অবস্থা/সমস্যা	যা অনুসন্ধান করতে হবে	
অনাকাঙ্ক্ষিত ওজন বৃদ্ধি বা হ্রাস, তলপেট ভারি লাগা	১. গ্রহীতাকে খাদ্য, পুষ্টি ও ব্যয়াম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে হবে।	১. (ক) গ্রহীতাকে উপযুক্ত খাদ্য, পুষ্টি ও ব্যয়াম সম্পর্কে পরামর্শ দিতে হবে। (খ) আশ্বস্ত করতে হবে যে, সকল হরমোনাল জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিরই ওজনের উপর কিছুটা প্রভাব রয়েছে। এই বড়িতে যে মাত্রায় হরমোন থাকে তা খুবই সামান্য এবং ওজন বৃদ্ধিতে এর প্রভাব নগণ্য। (গ) অতিরিক্ত ওজন বৃদ্ধি পেলে হরমোনবিহীন পদ্ধতির পরামর্শ দিতে হবে।
স্তনে ব্যথা/ভারি লাগা	১. মহিলা গর্ভবতী কি না পরীক্ষা করতে হবে। ২. স্তনে চাকা বা বোটা থেকে পুঁজ বের হচ্ছে কি না তা পরীক্ষা করতে হবে। ৩. যদি গ্রহীতা বুকের দুধ খাওয়ান এবং স্তনে স্পর্শকালে বেদনা অনুভূত হয় তাহলে পরীক্ষা করে দেখতে হবে যে স্তনে সংক্রমণ হয়েছে কি না?	১. গর্ভবতী না হলে আশ্বস্ত করতে হবে। ২. স্তনে চাকা বা পুঁজ নিঃসরণ থেকে ক্যান্সার সন্দেহ হলে বড়ি বন্ধ করে হরমোন বিহীন পদ্ধতির পরামর্শ দিতে হবে এবং চিকিৎসকের নিকট রেফার করতে হবে। ৩. জীবাণু সংক্রমণ না থাকলে স্তন স্বাভাবিক রাখার জন্য উপযুক্ত পোশাকের পরামর্শ দিতে হবে। স্তনে প্রদাহ থাকলে হালকা গরম শেক দিতে হবে এবং স্তন দান চালিয়ে যেতে হবে। প্রয়োজনে চিকিৎসকের নিকট রেফার করতে হবে।

অবস্থা/সমস্যা	যা অনুসন্ধান করতে হবে	
ফোঁটা ফোঁটা রক্তস্রাব বা দুই মাসিকের মধ্যবর্তী সময়ে রক্তস্রাব	১. গ্রহীতা অল্পদিন আগে বড়ি খাওয়া শুরু করেছেন কিনা? ২. গ্রহীতাকে জিজ্ঞেস করতে হবে যে তিনি একটি বা তার বেশি বড়ি খেতে ভুলে গিয়েছেন কিনা? ৩. গ্রহীতার মারাত্মক বমি বা ডায়রিয়া হয়েছিল কিনা? ৪. গ্রহীতা গর্ভবতী কি না অথবা গর্ভজনিত কোন জটিলতা আছে কিনা? ৫. জরায়ুতে টিউমার বা যৌনাঙ্গে প্রদাহ বা স্ত্রীরোগ আছে কিনা? ৬. কোন কারণ না পাওয়া গেলে।	১. গ্রহীতাকে আশ্বস্ত করতে হবে যে স্বল্প মাত্রার খাবার বড়ি শুরুর প্রথম দিকে এমন হতে পারে। ২. উত্তর হ্যাঁ হলে, বড়ি খাবার সঠিক নিয়মাবলী বলে দিতে হবে। ৩. বমি বা ডায়রিয়া হলে বড়ির কার্যকারিতা কমে যায় তাই ঐ সময়ে বড়ি খাওয়ার পাশাপাশি কনডম ব্যবহারের পরামর্শ দিতে হবে। ৪. গর্ভজনিত জটিলতার ক্ষেত্রে সেবা কেন্দ্রে পাঠাতে হবে। ৫. চিকিৎসকের পরামর্শের জন্য রেফার করতে হবে। ৬. গ্রহীতাকে আশ্বস্ত করতে হবে, আয়রন বড়ি সরবরাহ করতে হবে অথবা পদ্ধতি পরিবর্তন করার পরামর্শ দিতে হবে অথবা প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।
মাসিক বন্ধ থাকা	১. গ্রহীতাকে জিজ্ঞেস করতে হবে যে বড়ি খাওয়া বন্ধ করেছেন কিনা, বড়ি খাওয়া ভুলে গিয়েছেন কিনা। বড়ি খেতে ভুলে গেলে গর্ভধারণের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। ২. গ্রহীতা গর্ভবতী কিনা তা পরীক্ষা করতে হবে। ৩. এমন কোন ঔষধ খান কিনা যা খাবার বড়ির কার্যকারিতা কমিয়ে দেয় এবং গর্ভবতী হওয়ার সম্ভবনা বাড়িয়ে দেয়। যেমন- রিফামপিসিন, ফেনোবারবিটন, ফেনিটয়েন, কার্বামাজিপিন বা বার্বিচুরেট ইত্যাদি।	১. গর্ভবতী না হলে নিয়মিত বড়ি খাওয়ার পরামর্শ দিতে হবে এবং বুঝিয়ে বলতে হবে যে, জরায়ুর দেয়ালের ভেতরের আবরণ তৈরি না হওয়ার জন্য মাসিক হচ্ছে না। ২. গর্ভবতী হলে বড়ি খাওয়া নিষেধ করতে হবে এবং সেবা কেন্দ্রে যাওয়ার পরামর্শ দিতে হবে। ৩. সেবা কেন্দ্রে চিকিৎসকের নিকট রেফার করতে হবে।

কনডম

কনডম সর্ম্পকিত মৌলিক ধারণা

কনডম জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহৃত একটি রাবার বা ল্যাটেক্সের পাতলা আচ্ছাদন যা যৌনসঙ্গমের সময় পুরুষ ও নারীর যৌনাঙ্গের মধ্যে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। শুধুমাত্র জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি হিসাবে নয় কনডম যৌনবাহিত সংক্রমণের বিস্তারও রোধ করতে পারে। কনডম বিভিন্ন নাম ভিন্ন ভিন্ন রং আকার ও আকৃতিতে পাওয়া যায়। যেসব গ্রহীতার যৌনবাহিত সংক্রমণের ঝুঁকি রয়েছে তারা জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য অন্য যে পদ্ধতিই গ্রহণ করুন না কেনো তাদেরকে অবশ্যই যৌনমিলনের সময় কনডম ব্যবহার করতে হবে।

গর্ভ প্রতিরোধে কনডম কীভাবে কাজ করে

কনডম একটি প্রতিরোধক পদ্ধতি (Physical barrier) হিসাবে কাজ করে। বীর্যপাতের পর শুক্রকীট কনডমের ভিতরেই থেকে যায় এবং কনডম শুক্রকীটকে যোনীপথে ঢুকতে বাধা দেয়। ফলে শুক্রাণু ডিম্বানুর সঙ্গে মিলতে পারে না এবং গর্ভসঞ্চার হয় না। কনডমের সঠিক ব্যবহার জন্মনিয়ন্ত্রণ ও যৌনবাহিত রোগের বিস্তার রোধ করে। তবে কনডমের ভুল ব্যবহার ও ফেটে গেলে গর্ভধারণের ঝুঁকি থাকে।

কীভাবে বুঝবেন কনডমটি ভালো আছে

মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়নি। প্রতিটি কনডম আলাদা আলাদা প্যাকেটে থাকবে। দুটি পাশাপাশি প্যাকেটের মাঝখানে ছিদ্র বা আংশিক ফাঁকা থাকতে হবে, যাতে সহজেই বিচ্ছিন্ন করা যায়। উপাত্ত নিয়ন্ত্রণসহ ল্যাবরেটরীর সমস্ত প্রক্রিয়া ও সবস্তরের ফয়েল ল্যামিনেশন অক্ষত থাকতে হবে।

কনডমের কার্যকারিতা

সঠিক নিয়মে ব্যবহার করলে কনডম খুবই কার্যকর জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি। সঠিক নিয়মে ব্যবহার করলে ব্যর্থতার হার শতকরা মাত্র দুইভাগ।

কনডম ব্যবহারে সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ

সুবিধা

- কনডম শরীরের বাইরে প্রতিবন্ধক হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এটি কোনো ঔষধ নয়, সুতরাং অন্যান্য ঔষধ/হরমোন নির্ভর পদ্ধতির মতো এর কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া বা ক্ষতিকর প্রভাব নেই।
- নিরাপদ, হরমোনজনিত কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার আশংকা নেই।
- সঠিক নিয়মে ব্যবহার করলে জন্মনিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি এইচআইভি ও এইডস এবং অন্যান্য যৌন রোগ থেকে রক্ষা করে।
- যৌনবাহিত রোগ প্রতিরোধের মাধ্যমে নারীদের তলপেটে প্রদাহ তলপেটে ব্যথা এবং নারী ও পুরুষ উভয়কে বন্ধ্যাত্ব থেকে রক্ষা করে।
- সব পুরুষের জন্য উপযোগী।
- জন্মনিয়ন্ত্রণ ও যৌনবাহিত রোগ প্রতিরোধে পুরুষের অংশগ্রহণ ও দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করে।
- শুধুমাত্র যৌনমিলনের সময় ব্যবহার করতে হয়।
- অনির্ধারিত যৌনমিলনের জন্য পূর্ব হতে সংরক্ষণ করা যায়।

- সেবাপ্রদানকারীর সাহায্য ছাড়াই ব্যবহার করা যায়।
- যেকোনো স্থানে বিক্রি হয় তাই সহজলভ্য, দাম কম, পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই বললেই চলে।
- গর্ভধারণের ভয় থাকে না বলে যৌনমিলনে আনন্দ বাড়ায়।
- যেসব দম্পতি গর্ভধারণের সনাতন পদ্ধতি মেনে চলেন তারা উর্বর দিনগুলোতে (মাসিক চক্রের ৯ম থেকে ২০তম দিন পর্যন্ত) সহবাস করলে কনডম ব্যবহার করতে পারেন।
- নববিবাহিত দম্পতিদের জন্য এটি একটি উপযুক্ত পদ্ধতি।

অসুবিধা

- কোনো কোনো দম্পতির যৌনমিলনে অনুভূতি কম মনে হতে পারে।
- কারো কারো ল্যাটেক্স বা কনডম ব্যবহৃত পিচ্ছিলকারী পদার্থ হতে এলার্জি হতে পারে। অনেক সময় কনডম কেনা, পরা ও খোলা কারো জন্য লজ্জাজনক মনে হতে পারে।
- সঠিক নিয়মে না পরলে কনডম ফেটে যেতে পারে এবং তাতে গর্ভবতী হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।
- ব্যবহারের পর ব্যবহৃত কনডম ফেলে দেওয়ার জন্য সচেতনতা ও সাবধানতা প্রয়োজন হয়।

কনডম কারা ব্যবহার করবেন

১. যেকোনো প্রজনন সক্ষম পুরুষ জন্মনিয়ন্ত্রণ ও যৌনবাহিত রোগের সংক্রমণ রোধের জন্য কনডম ব্যবহার করতে পারেন।

২. কনডম ব্যবহারের জন্য কোনো ডাক্তারি পরীক্ষার প্রয়োজন হয় না। তাই যেসব দম্পতি শারীরিক সমস্যার কারণে জন্মনিয়ন্ত্রণে এর অন্যান্য পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেন না তারা সহজেই কনডম ব্যবহার করতে পারেন।

৩. জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য যেসকল দম্পতি স্থায়ী অথবা দীর্ঘমেয়াদি বা এক নাগাড়ে কোনো পদ্ধতি গ্রহণ করতে চান না তারা কনডম ব্যবহার করতে পারেন।

৪. স্বামী বা স্ত্রীর মধ্যে যদি কারো বা উভয়ের যৌনবাহিত রোগ থাকে তবে তাদের একজনের কাছ থেকে অন্যজনের মধ্যে রোগ বিস্তার রোধে কনডম অত্যন্ত উপযোগী।

৫. সন্তান প্রসবের পর প্রথম ৬ মাস স্তনদানকালে কার্যকর গর্ভনিরোধের জন্য কনডম ব্যবহার করতে পারেন।

৬. যেসকল দম্পতি দীর্ঘমেয়াদি ও স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের জন্য অপেক্ষা করছেন তারা কনডম ব্যবহার করতে পারেন।

৭. ভ্যাসেকটমি গ্রহণ করার পর স্ত্রী যদি কোনো অস্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণ না করেন, সেক্ষেত্রে স্বামীকে ৩ মাস পর্যন্ত কনডম ব্যবহার করতে হবে।

কনডমের ব্যবহার বিধি

১. কনডম কেনার সময়/ব্যবহারের পূর্বে মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ ও ল্যামিনেশন প্যাকেট অক্ষত আছে কি না তা দেখে নিতে হবে।

২. সহবাসের আগে কনডম প্যাকেট থেকে খুলে উত্থিত পুরুষাঙ্গে পরে নিতে হবে।

৩. কনডম পরার সময় সামনের অংশ টিপে ধরে নিতে হবে যেন উত্থিত পুরুষাঙ্গে পরার পর সামনে ১.৫ সেন্টি মিটার অতিরিক্ত জায়গা বীর্য ধারণের জন্য থাকে এবং ভিতরে কোনো বাতাস না থাকে। বাতাস থাকলে কনডম ফেটে যেতে পারে।

৪. বীর্যপাত হওয়ার পরপরই উত্থিত থাকা অবস্থায় কনডমের গোড়া চেপে ধরে যোনীপথ থেকে পুরুষাঙ্গ বের করতে হবে। এই সর্তকতার উদ্দেশ্য হলো যাতে কোনো বীর্য যোনীপথে ঢুকে যেতে না পারে।

৫. কনডম কাগজে মুড়িয়ে বা প্যাকেটে জড়িয়ে ডাস্টবিনে ফেলতে হবে অথবা সম্ভব হলে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে। ব্যবহারের পর এমন স্থানে ফেলতে হবে বা বিনষ্ট করতে হবে যাতে অস্বস্তি বা লজ্জাকর অবস্থার সৃষ্টি না হয়।

৬. কনডম কখনও টয়লেটের কমোড বা প্যানে ফেলা যাবে না, কারণ তা পয়ঃনিষ্কাশনে বাধা সৃষ্টি করতে পারে বা স্যুয়রেজ পাইপ/লাইন বন্ধ হয়ে যেতে পারে

টিপস

যদি সন্দেহ হয় কনডম ফেটে গেছে, তবে জরুরি গর্ভনিরোধক বড়ি খেতে হবে। এজন্য যারা কার্যকরভাবে কনডম ব্যবহার করতে চান তাদের উচিত সবসময় ঘরে জরুরি গর্ভনিরোধক বড়ি রাখা।

গর্ভনিরোধক ইনজেকশন

বাংলাদেশের জাতীয় পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমে শুধুমাত্র প্রজেস্টেরণ সমৃদ্ধ গর্ভনিরোধক ইনজেকশন প্রচলিত আছে। এই ইনজেকশনের প্রজেস্টেরণ হরমোনের নাম মেড্রোক্সি প্রজেস্টেরন এসিটেট। গর্ভনিরোধক ইনজেকশন পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিতে "স্বস্তি" নামকরণ করা হয়েছে। এটি নারীদের জন্য একটি বহুল ব্যবহৃত এবং অত্যন্ত কার্যকর জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি যা ৩ মাস পর পর গভীর মাংসপেশীতে প্রয়োগ করা হয়। ইনজেকশনটি ১ মি. লি. ভায়ালে সরবরাহ করা হয় যার মধ্যে ১৫০ মিলিগ্রাম মেড্রোক্সি প্রজেস্টেরণ এসিটেট হরমোন থাকে।

গর্ভনিরোধক ইনজেকশন কীভাবে কাজ করে

১. ডিম্বাশয়ে ডিম্ব স্ফুটনে বাধা দেয়।
২. জরায়ুর মুখে নিঃসৃত রসকে ঘন এবং চটচটে করে যার ফলে জরায়ুতে শুক্রকীট প্রবেশে বাধার সৃষ্টি হয়।
৩. জরায়ুর ভিতরের দেওয়ালকে (এন্ডোমেট্রিয়াম) গর্ভসঞ্চারের জন্য উপযোগী হতে দেয় না।

কার্যকারিতা

- প্রায় শতভাগ কার্যকর। প্রতি ১০০০ জনে মাত্র ৩ জন নারী গর্ভধারণ করেন।

গর্ভনিরোধক ইনজেকশনের সুবিধা অসুবিধাসমূহ

সুবিধা

১. অত্যন্ত কার্যকর ও নিরাপদ জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি।

২. গোপনীয়তা রক্ষা করে নেওয়া যায়।

৩. প্রতিদিন খাওয়ার বা ব্যবহার করার ঝামেলা থাকে না। একটি ইনজেকশন কমপক্ষে ৩ মাস পর্যন্ত গর্ভধারণে বাধা প্রদান করে।

৪. অস্থায়ী পদ্ধতি, কাজেই পদ্ধতি ছেড়ে দিলে পুনরায় সন্তান ধারণ করা সম্ভব।

৫. গর্ভনিরোধক ইনজেকশন মায়ের বুকের দুধের পরিমাণগত ও গুণগত মানের উপর কোনো প্রভাব ফেলে না, ফলে সন্তান জন্মদানের ৬ সপ্তাহ পরেই এটি ব্যবহার করা যায়।

৬. ইস্ট্রোজেনজনিত জটিলতা যেমন রক্ত জমাট বাধা/হার্ট এ্যাটাকের সমস্যা দেখা যায় না এবং যেসব ক্ষেত্রে ইস্ট্রোজেন ব্যবহার নিষিদ্ধ সেসব ক্ষেত্রে ডিএমপিএ ব্যবহার করা যায়।

৭. জরায়ুর বাহিরে গর্ভসঞ্চারের ঝুঁকি কমায়।

৮. কখনো কখনো মাসিক বন্ধ করে দেয় বলে রক্তস্বল্পতা কমায়।

৯. জরায়ুর ভিতরের দেওয়ালে (এন্ডোমেট্রিয়াম) ক্যান্সার প্রতিরোধে সহায়তা করে।

১০. জরায়ুতে টিউমার প্রতিরোধে সহায়তা করে।

১১. সিকল সেল এনিমিয়ায় আক্রান্ত রোগীরা ইনজেকশন ব্যবহার করলে রক্তস্বল্পতা কম হয়ে থাকে।

১২. কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর ব্যবহারের ফলে কিছু স্ত্রী রোগ যেমন- এন্ডোমেট্রিওসিস, ডিম্বাশয়ের সিস্ট ইত্যাদির প্রকোপ কমায়।

অসুবিধা

১. মাসিক চক্রে অনিয়ম, যেমন- ফোঁটা ফোঁটা রক্তস্রাব বা অনিয়মিত রক্তস্রাব, দীর্ঘস্থায়ী বা অতিরিক্ত রক্তস্রাব, মাসিক বন্ধ থাকে। সাধারণত একটানা একবছর ব্যবহার করার পর কারো কারো মাসিক দীর্ঘদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যেতে পারে। কোনো কোনো নারী এটাকে সুবিধা হিসাবে গণ্য করেন।

২. ওজন বৃদ্ধি পেতে পারে।

৩. গর্ভনিরোধক ইনজেকশন নেওয়া বন্ধ করার পর পুনরায় সন্তান ধারণ করতে সাধারণত ৬-১২ মাস সময় লাগতে পারে।

৪. দীর্ঘ দিন ব্যবহারে অস্থি-র (হাঁড়ের) ঘনত্ব কমে যেতে পারে।

৫. গর্ভনিরোধক ইনজেকশন নেওয়ার জন্য ৩ মাস পর পর সেবা কেন্দ্রে অথবা পরিবার কল্যাণ সহকারী/মাঠকর্মীর কাছে যেতে হয়।

৬. কোনো কোনো নারীর মাথা ধরে, মাথা ঝিম ঝিম করে, স্তন ভারি এবং ব্যথা অনুভূত হয়, মানসিক অবসাদ ও মেজাজ খিটখিটে হয়, স্বামী সহবাসের ইচ্ছা কমে যায়।

৭. কিছু কিছু ক্ষেত্রে এলার্জিক রি-এ্যাকশন দেখা দিতে পারে।

৮. যৌনরোগ বা প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারে না।

যাদের জন্য উপযুক্ত

১. কমপক্ষে একটি জীবিত সন্তান থাকতে হবে।

২. কমবয়সী বা স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের পূর্বে পরবর্তী সন্তান জন্মদান বিলম্বিত করার জন্য এই পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য হতে পারে। অথবা যাদের দুই বা বেশি সন্তান আছে কিন্তু স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণ করতে আগ্রহী নন।

৩. যেসব ক্ষেত্রে কার্যকর গর্ভনিরোধক প্রয়োজন অথচ এস্ট্রোজেন ব্যবহার নিষিদ্ধ তাদের জন্য ইনজেকশন উপযোগী।

৪. যারা বার বার বড়ি খেতে ভুলে যান অথবা বড়ি ব্যবহারে অসুবিধা হয় তাদের জন্য ইনজেকশন উপযোগী।

৫. শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ানো অবস্থায় গর্ভনিরোধক পদ্ধতি ব্যবহার করতে চাইলে।

৬. যারা এন্ড্রোমেট্রিওসিস রোগে ভুগছেন তাদের জন্যও ইনজেকশন উপযোগী

৭. যারা আইইউডি ব্যবহার করতে পারেন না (ঝুঁকিপূর্ণ গ্রহীতাদের আইইউডি ব্যবহারে প্রজননতন্ত্রে সংক্রমণ হওয়ার ভয় থাকে)

৮. গ্রহীতার সিকল সেল এনিমিয়া থাকলে।

গ্রহীতা বাছাইকরণ

গর্ভনিরোধক ইনজেকশন প্রথম শুরু করার পূর্বে ইচ্ছুক গ্রহীতার ব্যক্তিগত প্রজনন ও মেডিকেল ইতিহাস জানতে হবে এবং শারীরিক পরীক্ষা করতে হবে। উক্ত ইতিহাস ও শারীরিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত বিষয়গুলো ইনজেকশন গ্রহণেচ্ছুক পূর্ণ বিবরণী ও বাছাইকরণ ফর্ম-এ লিপিবদ্ধ করতে হবে।

ইনজেকটেবল্‌স পদ্ধতি বাছাইকরণ চেকলিস্ট

গ্রহীতাকে নিচের প্রশ্নগুলো করুন। সকল প্রশ্নের উত্তর "না" হলে পদ্ধতি দেওয়া যাবে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর "হ্যাঁ" হলে পদ্ধতি দেওয়া যাবে না। এক্ষেত্রে গ্রহীতাকে বিস্তারিত পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা বা চিকিৎসকের নিকট প্রেরণ করতে হবে।

ইনজেকটেবল্‌স পদ্ধতি বাছাইয়ের ক্ষেত্রে প্রশ্নমালা	উত্তর	
	হ্যাঁ	না
আপনার ছোট সন্তানের বয়স কি ছয় সপ্তাহের কম?		
আপনি কি মনে করেন আপনার পেটে সন্তান এসেছে অথবা আপনার কি ৪ সপ্তাহের বেশি মাসিক বন্ধ আছে?		
আপনি কি উচ্চ রক্তচাপে (রক্তচাপ ১৬০/১০০ মি মি পারদ বা তার বেশি) ভুগছেন?		
আপনার পায়ের শিরা কি ফুলে আছে এবং এগুলো থেকে কি ব্যথা হয়?করেন?		

ইনজেকটেবল্‌স পদ্ধতি বাছাইয়ের ক্ষেত্রে প্রশ্নমালা	উত্তর	
	হ্যাঁ	না
আপনার স্তনে কি শক্ত চাকা/দলা আছে?		
সামান্য কাজ করার পরে কি আপনার বুকে ব্যথা হয় অথবা আপনি কি হাঁপিয়ে ওঠেন? (ইসকেমিক হৃদরোগে আক্রান্ত বা পূর্বে স্ট্রোক হয়ে থাকলে)		
দুই মাসিকের মাঝামাঝি সময়ে বা সহবাসের পর আপনার কি রক্ত যায়?		
আপনার মাসিকে কি অতিরিক্ত রক্ত যায় (রক্তক্ষরণের কারণ খুঁজে পাওয়া না গেলে)?		
আপনার কি লিভারের রোগ (মারাত্মক সিরোসিস, লিভারের টিউমার, ক্যান্সার) আছে?		
আপনি কি ডায়াবেটিস বা বহুমূত্রজনিত জটিল রোগে (২০ বছরের অধিক) ভুগছেন?		

১. গ্রহীতা উপরোক্ত সবগুলো প্রশ্নের উত্তর "না" বললে তিনি জন্মনিয়ন্ত্রণের ইনজেকশন ব্যবহার করতে পারবেন। গ্রহীতা পরের যেকোনো একটি বা তার বেশি প্রশ্নের উত্তর "হ্যাঁ" বললে জন্মনিয়ন্ত্রণের ইনজেকশন তার জন্য আদর্শ পদ্ধতি নয়। গ্রহীতাকে বিস্তারিত পরীক্ষার জন্য ডাক্তারের নিকট পাঠাতে হবে।

২. ডাক্তারি পরীক্ষায় প্রয়োগ নিষেধ সংক্রান্ত অসুখ থাকলে তাকে অন্য একটি সুবিধাজনক পদ্ধতি বেছে নিতে সাহায্য করতে হবে।

৩. কোনো প্রয়োগ নিষেধ না থাকলে মেনোপোজ না হওয়া পর্যন্ত গ্রহীতা ইনজেকশন ব্যবহার করতে পারবেন।

৪. স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসক বা এফডব্লিউভি/প্যারামেডিক গ্রহীতা বাছাইকরণের পর ইনজেকশনের ১ম ডোজ ও পরবর্তী ডোজ দিবেন।

৫. তবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পরিবার কল্যাণ সহকারী বা এনজিও মাঠকর্মীরা তাদের কর্মএলাকায় ২য় ডোজ থেকে ইনজেকশন দিতে পারবেন।

ইনজেকশন দেয়ার উপযুক্ত সময়

১. মাসিক শুরুর প্রথম ৫ দিনের মধ্যে প্রথম ডোজ ইনজেকশন নিতে হয়

২. গর্ভবতী নয় এটা নিশ্চিত হলে মাসিকের যে কোন সময় যেমন- গত মাসিকের পর সহবাস না করে থাকলে, অন্য কোন কার্যকর জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সঠিকভাবে ব্যবহার করা অবস্থায় ইত্যাদি

৩. ক. শিশুকে বুকের দুধ পান করালে প্রসবের ৬ সপ্তাহ পর থেকে

খ. শিশুকে বুকের দুধ পান না করালে প্রসবের পরপরই

৪. গর্ভপাতের ৭ দিনের মধ্যে

৫. এমআর করার ৭ দিনের মধ্যে

৬. আধুনিক অন্যান্য জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি নিয়মিতভাবে ব্যবহার বন্ধ করার পর পরই।

ইনজেকশনের ডোজ বা মাত্রার পরিমাণ এবং প্রয়োগবিধি

প্রথম ডোজ: গ্রহীতা নির্বাচনের পর ১৫০ মিলিগ্রাম ডিএমপিএ/গর্ভনিরোধক ইনজেকশন গভীর মাংসপেশীতে দেয়া হয়।

পরবর্তী ডোজ: ডিএমপিএ/গর্ভনিরোধক ইনজেকশন প্রথম ডোজ দেয়ার পরে পরবর্তী ডোজসমূহ তিন মাস পর পর দিতে হবে। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে (যেমন রমজান, বন্যা, বিদেশ ভ্রমন, স্থান পরিবর্তন) ডিউ ডোজের পূর্ববর্তী ১৪ দিনের মধ্যে অথবা পরবর্তী ২৮ দিনের মধ্যে দেয়া যেতে পারে। ডিউ ডোজের পূর্ববর্তী ১৪ দিন এবং পরবর্তী ২৮ দিন পর্যন্ত এই সময়কে 'উইন্ডো পিরিয়ড' বলে।

পরবর্তী ডোজের জন্য গ্রহীতাকে কি পরামর্শ দিতে হবে

ডিএমপিএ ইনজেকশনের জন্য ৩ মাস পর পর ইনজেকশন নিতে হবে। যদি কোন কারণে নির্ধারিত তারিখে বা উইন্ডো পিরিয়ডের মধ্যে ইনজেকশন না দিতে পারে তাহলে যৌন সঙ্গম থেকে বিরত থাকতে হবে বা কনডম ব্যবহার করতে হবে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্থানীয় পরিবার কল্যাণ সহকারী/এনজিও কর্মীদের সাথে বা ক্লিনিকে যোগাযোগ করতে হবে। পরিবার কল্যাণ সহকারী/ এনজিও কর্মীগণ ইনজেকশন ডিএমপিএ এর দ্বিতীয় ও তৎপরবর্তী ডোজসমূহ দিয়ে থাকেন। গ্রহীতাকে প্রদত্ত ফলোপআপ কার্ডেও পরবর্তী ডোজের তারিখ লিখে দিতে হবে এবং সে অনুযায়ী পরবর্তী ডোজের সময় আসতে পরামর্শ দিতে হবে।

পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া ও জটিলতা ব্যবস্থাপনা

অনেক সময় এক বা একাধিক সমস্যা একইসাথে একজন গ্রহীতার মধ্যে দেখা দিতে পারে কিন্তু কোন গ্রহীতার ক্ষেত্রে কি ধরনের সমস্যার উদ্ভব হবে সেটা আগে থেকে বোঝা সম্ভব নয়। উপযুক্ত কাউন্সেলিং, সঠিক গ্রহীতা নির্বাচন, পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া সমূহের প্রতিকার এবং আশ্বাস প্রদানের মাধ্যমেই অনেক পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়াকে গ্রহীতার নিকট গ্রহণযোগ্য করে তোলা সম্ভব। আর তাহলে ছোটখাটো কিছু সমস্যা থাকলেও গ্রহীতা ইনজেকশন নেয়া অব্যাহত রাখতে পারেন।

পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া ও জটিলতার ক্ষেত্রে মাঠকর্মীর দ্বারা ব্যবস্থা প্রদান

ফলো-আপ

গর্ভনিরোধক ইনজেকশন যে সব কেন্দ্রে প্রদান করা হয়ে থাকে যেমন- মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মডেল ক্লিনিক, জেলা হাসপাতাল, মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে, বেসরকারি সংস্থার ক্লিনিক, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, কমিউনিটি ক্লিনিক এবং স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে গ্রহীতাকে ফলো-আপ নিশ্চিত করতে হবে। কারণ ফলো-আপ এর সময় এই পদ্ধতির পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া জনিত সমস্যার সমাধান করা যায় এবং একে গ্রহণযোগ্য করে তোলা যায়। ফলো-আপের সময় পরবর্তী ইনজেকশনের সময়, স্থান ইত্যাদি সম্বন্ধে গ্রহীতাকে অবহিত করার মাধ্যমে ইনজেকশনের ড্রপ-আউটের হার কমানো সম্ভব।

গর্ভনিরোধক ইনজেকশন গ্রহণকারীর কার্ড

কার্ডটি চালু করা হয়েছে মূলতঃ গর্ভনিরোধক ইনজেকশন ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্যের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে। কার্ডে লিপিবদ্ধ তথ্যের সাহায্যে ইনজেকশন গ্রহণকারী এবং বিভিন্ন স্তরের কর্মী ও কর্মকর্তা সহজেই জানতে পারবেন, একজন ক্লায়েন্ট কবে থেকে কি ধরণের ইনজেকশন নিচ্ছেন, পরবর্তী ডিউ ডোজ কবে নিতে হবে ইত্যাদি। কার্ডটি ক্লায়েন্ট তার কাছে যত্ন সহকারে সংরক্ষণ করবেন এবং প্রতিবার ইনজেকশন নেয়ার সময় কর্মী বা কর্মকর্তাকে প্রদর্শন করবেন।

পরিবার কল্যাণ সহকারীর করণীয়ঃ

- কার্ড পাননি এমন পুরাতন ইনজেকশন গ্রহণকারীকে কার্ড সরবরাহের ব্যবস্থা করবেন
- কার্ডটি যত্ন সহকারে সংরক্ষণ করার জন্য ক্লায়েন্টকে পরামর্শ দিবেন।
- পরবর্তী ডিউ ডোজ দেয়ার সময় কার্ডটি নবায়ন করবেন। এবং
- কোন কারণে কার্ড হারিয়ে গেলে অথবা কার্ডের সবকটি ঘর পূরণ হয়ে গেলে নতুন কার্ডের ব্যবস্থা করবেন।

মনে রাখতে হবে: সকল ড্রপআউট ক্লায়েন্ট পুনরায় গর্ভনিরোধক ইনজেকশন নিতে চাইলে নতুন ক্লায়েন্ট হিসাবে গণ্য হবে।

জন্মনিরোধক ইনজেকশন বিষয়ে সারসংক্ষেপ

- ইনজেকশন শুরু করার উপযুক্ত সময়: মাসিক শুরুর প্রথম ৫ দিনের মধ্যে
- গর্ভবতী নয় এটা নিশ্চিত হলে মাসিকের যে কোন সময় (যেমন- গত মাসিকের পর সহবাস না করে থাকলে বা অন্য কোন কার্যকর জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সঠিকভাবে ব্যবহার করা অবস্থায়)
- প্রসব পরবর্তী সময় শিশুকে বুকের দুধ পান করালে প্রসবের ৬ সপ্তাহ পর থেকে
- প্রসব পরবর্তী সময় শিশুকে বুকের দুধ পান না করালে প্রসবের পরপরই
- গর্ভপাতের বা এমআর (MR) করার ৭ দিনের মধ্যে
- আধুনিক অন্যান্য জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি নিয়মিতভাবে ব্যবহার বন্ধ করার সাথে সাথেই।

ইনজেকশনের ডোজ বা মাত্রার পরিমাণ এবং প্রয়োগ বিধি

প্রথম ডোজ-

গ্রহীতা নির্বাচনের পর ভায়ালের সম্পূর্ণ ইনজেকশন গভীর মাংসপেশীতে দেয়া হয়।

পরবর্তী ডোজ-

ডিএমপিএ ইনজেকশন প্রথমবার দেয়ার পরে পরবর্তী ডোজসমূহ তিন মাস পর পর দিতে হবে। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে (যেমন- রমজান, বন্যা, বিদেশ ভ্রমণ, স্থান পরিবর্তন) ডিউ ডোজের পূর্ববর্তী ১৪ দিনের মধ্যে অথবা পরবর্তী ২৮ দিনের মধ্যে দেয়া যেতে পারে। ডিউ ডোজের পূর্ববর্তী ১৪ দিন এবং পরবর্তী ২৮ দিন পর্যন্ত এই সময়কে 'উইন্ডো পিরিয়ড' (Window period) বলে।

ইনজেকশন প্রয়োগের নিয়ম-

১. প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গুছিয়ে নিন। যেমন- জীবাণুমুক্ত এডি সিরিঞ্জ (১ সিসি), তুলা, এন্টিসেপ্টিক দ্রবণ

২. ঔষুধের ভায়ালের মেয়াদকাল দেখে নিন।

৩. ডিএমপিএ'র ভায়াল সব সময় খাড়াভাবে রাখুন।

৪. গ্রহীতাকে বুঝিয়ে বলুন আপনি কি করতে যাচ্ছেন।

৫. ইনজেকশন দেয়ার জায়গা এন্টিসেপ্টিক যুক্ত তুলা দিয়ে পরিষ্কার করে নিন। প্রয়োজনবোধে প্রথমে ইনজেকশনের স্থান সাবান পানি দিয়ে ধুয়ে নিন। ডিএমপিএ ইনজেকশন বাহুর উপরের এবং বাহিরের অংশে (ডেল্টয়েড) দেয়া ভাল। তবে নিতম্বের গ্লুটিয়াল মাংসপেশীতেও দেয়া যায়।

৬. ডিএমপিএ'র ভায়াল দুই আঙ্গুলের মধ্যে লম্বালম্বিভাবে রেখে হালকাভাবে ঝাঁকিয়ে নিতে হবে।

৭. সিরিঞ্জে ঔষধ তোলার সময় লক্ষ্য করুন যাতে ঔষধের পরিমাণ ১ মি.লি. এর কম না হয়।

৮. সাধারণত: ইনজেকশন দেবার সময় মাংসপেশীতে খাড়াভাবে (৯০ ডিগ্রী কোণে সুঁচ ঢুকানো হয়। অতঃপর সিরিঞ্জের প্লাঞ্জার বাইরের দিকে টেনে দেখে নিন কোন শিরা বা ধমনীর মধ্যে সুঁচ প্রবেশ করেছে কি-না। যদি না করে থাকে তবে সিরিঞ্জের ভিতরের তরলটুকু মাংসপেশীতে পুশ করুন। পুশ করা শেষ হলে এক টানে সুঁচটি বের করুন।

৯. ম্যাসাজ করলে ইনজেকশনের কার্যকারিতা তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়। কাজেই গ্রহীতাকে ম্যাসাজ করতে নিষেধ করবেন। শুধুমাত্র এক টুকরা তুলা দিয়ে সুঁচ ফুটানোর জায়গায় অল্প কিছুক্ষণের জন্য হালকাভাবে চেপে ধরে রাখুন।

১০.সিরিঞ্জ গুলো ব্যবহারের পর পরই নিয়ম অনুযায়ী সেফটি বক্সে ফেলুন।

১১.পাত্রের তিন চতুর্থাংশ সিরিঞ্জে পূর্ণ হলে তা নিয়মানুযায়ী গর্ত করে পুড়িয়ে পুঁতে ফেলুন।

১২.ইনজেকশনের খালি ভায়ালসমূহ সংরক্ষণ করুন এবং নিয়মানুয়ায়ী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দিন।

পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া ও জটিলতা ব্যবস্থাপনা

অনেক সময় এক বা একাধিক সমস্যা একইসাথে একজন গ্রহীতার মধ্যে দেখা দিতে পারে কিন্তু কোন গ্রহীতার ক্ষেত্রে কি ধরনের সমস্যার উদ্ভব হবে সেটা আগে থেকে বোঝা সম্ভব নয়। উপযুক্ত কাউন্সেলিং, সঠিক গ্রহীতা নির্বাচন, পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া সমূহের প্রতিকার এবং আশ্বাস প্রদানের মাধ্যমেই অনেক পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়াকে গ্রহীতার নিকট গ্রহণযোগ্য করে তোলা সম্ভব। আর তাহলে ছোট খাট কিছু সমস্যা থাকলেও গ্রহীতা ইনজেকশন নেয়া অব্যাহত রাখতে পারেন।

অবস্থা/সমস্যা	সমাধান
ছোটখাটো সমস্যা যেমন ওজন বেড়ে যাওয়া, তলপেট ভারি ভারি লাগা, ব্যথা অনুভব করা, মাথা ধরা, মানসিক দুশ্চিন্তা	মনোযোগ সহকারে গ্রহীতার সব সমস্যার কথা শুনতে হবে। শারীরিক পরীক্ষার পর গ্রহীতাকে আশ্বস্ত করতে হবে যে সাধারণত কয়েক মাসের মধ্যে এসব উপসর্গ দূর হয়ে যাবে।
মাসিক বন্ধ থাকা	গ্রহীতাকে আশ্বস্ত করতে হবে যে, সাধারণত গর্ভনিরোধক ইনজেকশন গ্রহীতাদের মধ্যে এটা হওয়া স্বাভাবিক। এতে দুঃশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। গ্রহীতা গর্ভবতী কিনা নিশ্চিত হয়ে হবে। যদি আরো কিছু দিন মাসিক বন্ধ থাকে এবং আশ্বস্ত করার পরও গ্রহীতা উদ্বিগ্ন থাকে তবে পরীক্ষা করার জন্য চিকিৎসক/এফডব্লিউভি/প্যারামেডিকের নিকট প্রেরণ করতে হবে অথবা পদ্ধতি পরিবর্তন করে তাকে খাবার বড়ি বা অন্য কোন পদ্ধতি গ্রহণ করার পরামর্শ দিতে হবে।

অবস্থা/সমস্যা	সমাধান
দুই মাসিকের অন্তর্বর্তীকালে রক্তস্রাব হওয়া বা ফোঁটা ফোঁটা রক্তস্রাব	গ্রহীতাকে আশ্বস্ত করতে হবে যে, সাধারণত কয়েক মাসের মধ্যেই এ সমস্ত সমস্যা দূর হয়ে যাবে। কেননা সাময়িক ভাবে গর্ভনিরোধক ইনজেকশনের এ ধরনের সমস্যার উদ্ভব হয়ে থাকে। কিন্তু কয়েক মাস পরেও এ অবস্থা চলতে থাকলে গ্রহীতাকে আয়রণ ট্যাবলেট এবং প্রতিদিন একটি করে সাধারণমাত্রা/স্বল্পমাত্রার খাবার বড়ি ২১ দিন পর্যন্ত খাবার জন্য সরবরাহ করতে হবে।
অতিরিক্ত রক্তস্রাব হওয়া	ভালোভাবে প্রশ্ন করে জানতে হবে গ্রহীতার অন্য কোন অসুবিধা যেমন- চাকা চাকা রক্তস্রাব, তলপেটে ব্যথা, দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব ইত্যাদি আছে কি-না যদি থাকে তাহলে গ্রহীতাকে চিকিৎসকের নিকট রেফার করতে হবে। অন্য কোন অসুবিধা না থাকলে গ্রহীতাকে ১টি করে সাধারণমাত্রা/স্বল্পমাত্রার খাবার বড়ি ২১ দিন পর্যন্ত খাওয়ার পরামর্শ দিতে হবে এবং বড়ি সরবরাহ করতে হবে। প্রয়োজনে ২-৩ চক্র বড়ি খেতে হবে।
গর্ভনিরোধক ইনজেকশনের স্থানে সংক্রমণ হওয়া	চিকিৎসক-এর নিকট যাওয়ার জন্য পরামর্শ দিতে হবে এবং তাকে সাময়িকভাবে কনডম ব্যবহারের পরামর্শ দিতে হবে।
চোখ এবং চামড়া অথবা এর যে কোন একটি হলুদ বর্ণ ধারণ করা (জন্ডিস হলে)।	গ্রহীতাকে গর্ভনিরোধক ইনজেকশন নেয়া বন্ধ করতে বলতে হবে এবং তাকে চিকিৎসক/এফডব্লিউভি/প্যারামেডিকের সঙ্গে পরামর্শ করার জন্য পাঠাতে হবে। পরবর্তী ইনজেকশন নেয়ার তারিখ পার হয়ে গেলে কনডম বা আইউডি ব্যবহারের জন্য পরামর্শ দিতে হবে এবং তা সরবরাহ করতে হবে।
ঘন ঘন প্রচণ্ড মাথা ব্যথা হওয়া এবং চোখে ঝাঁপসা দেখা পায়ের পেছনে প্রচন্ড ব্যথা হওয়া এবং তা কয়েকদিন স্থায়ী হওয়া	গ্রহীতাকে গর্ভনিরোধক ইনজেকশন নেয়া বন্ধ করতে বলতে হবে এবং তাকে চিকিৎসক/এফডব্লিউভি/প্যারামেডিকের সঙ্গে পরামর্শ করার জন্য পাঠাতে হবে। পরবর্তী ইনজেকশন নেয়ার তারিখ পার হয়ে গেলে কনডম বা আইউডি ব্যবহারের জন্য পরামর্শ দিতে হবে এবং তা সরবরাহ করতে হবে।
ইনজেকশন নেয়া বন্ধ করার পরও গর্ভবতী না হওয়া	গ্রহীতাকে বুঝাতে হবে গর্ভনিরোধক ইনজেকশন নেয়া বন্ধ করার পরও সাধারণত পুনরায় গর্ভবর্তী হতে ৬-১২ মাস সময় লাগতে পারে।
অন্য কোন অসুবিধা দেখা দেয়া; যেমন- বহুমূত্র (ডায়াবেটিস)	এ রোগ থাকলেও যদি তা নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় থাকে তবে গর্ভনিরোধক ইনজেকশন ব্যবহার করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে গ্রহীতাকে ভাল ভাবে ফলো-আপ করতে হবে। প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে বলতে হবে।

অবস্থা/সমস্যা	সমাধান
ওজন বৃদ্ধি	• গ্রহীতার সাথে আলোচনা করে তার খাবার অভ্যাস বদলানোর পরামর্শ দিতে হবে। • গর্ভনিরোধক ইনজেকশন শুরু করার পর যদি খাবার স্পৃহা বেড়ে যায় এবং তার ফলে অতিরিক্ত ওজন বৃদ্ধি পায় তাহলে নন-হরমোনাল জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণের প্রয়োজন হতে পারে। • ওজন কমানোর জন্য গ্রহীতার সাথে পরামর্শ করে যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়; ▪ কম খাওয়া, অল্প করে খাবার দেরি করে খাওয়া ▪ যোগ আসন বা অন্য ব্যয়াম করা ▪ দিনে প্রায় ১ ঘণ্টা হাঁটার অভ্যাস স্বাস্থ্যের জন্য ভালো ▪ দিনে ১০-১২ গ্লাস পানি খাওয়া ▪ বেশি করে শশা, তরকারি ও ফলমূল খাওয়া ▪ তৈলাক্ত ও চর্বি যুক্ত খাবার কম খাওয়া
ঝিমুনি	• গ্রহীতাকে আশ্বস্ত করতে হবে • রক্তস্বল্পতা, উচ্চ বা নিম্ন রক্তচাপ, রক্তে শর্করা আছে কি-না নির্ণয় করে তাদের চিকিৎসা দিতে হবে। • যদি অন্য কোন কারণ না থাকে এবং ঝিমুনি ভাব কম থাকে তাহলে আশ্বস্ত করতে হবে। এতে কাজ না হলে নন-হরমোনাল অন্য কোন পদ্ধতি গ্রহণের জন্য পরামর্শ দিতে হবে।
মানসিক অবসাদ	• পারিবারিক, অর্থনৈতিক, বৈবাহিক, সামাজিক কোন সমস্যা আছে কি-না জানতে হবে। • গর্ভনিরোধক ইনজেকশন নেয়ার পর মানসিক অবসাদ বৃদ্ধি পেলে অন্য কোন নন-হরমোনাল পদ্ধতি গ্রহণের জন্য পরামর্শ দিতে হবে। কিন্তু যদি অবসাদ বৃদ্ধি না পেয়ে থাকে তাহলে ইনজেকশন চালিয়ে যেতে পারে। • গ্রহীতার সাথে কথা বলে জানতে হবে যে তার অবশভাব, দূর্বলতা, চোখের অসুবিধা ইত্যাদি উপসর্গও সঙ্গে আছে কিনা। এ রকম থাকলে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র জনিত সমস্যা আছে কিনা তা দেখতে হবে, থাকলে গর্ভনিরোধক ইনজেকশন বন্ধ করতে হবে এবং বিকল্প হিসেবে নন-হরমোনাল কোন পদ্ধতি নিতে পরামর্শ দিতে হবে।

অবস্থা/সমস্যা	সমাধান
মাথা ধরা	• মাথা ধরার অন্য কোন কারণ থাকলে তার জন্য পরামর্শ দিতে হবে। • মাথা ধারার জন্য সাধারণ বেদনানাশক ঔষধ যেমন- প্যারাসিটামল দেয়া যেতে পারে। • মাথা ধরা একেবারে না সারলে ডাক্তারের সাথে পরামর্শের জন্য রেফার করতে হবে বা অন্য কোন নন-হরমোনাল পদ্ধতি ব্যবহারের পরামর্শ দিতে হবে।
গর্ভনিরোধক ইনজেকশনের জায়গা পেঁকে যাওয়া	• গর্ভনিরোধক ইনজেকশন প্রদানের সময় জীবাণুমুক্ত পদ্ধতি অনুসরণ না করলে ইনজেকশনের স্থান পেকে যেতে পারে। স্পর্শ করলে গরম লাগে এবং ব্যাথা হয়। জীবাণু সংক্রমণ সাধারণত গর্ভনিরোধক ইনজেকশন নেয়ার কয়েক দিনের মধ্যেই হয়ে থাকে। • সংক্রমণের ক্ষেত্রে চিকিৎসা হচ্ছে কেটে পুঁজ বের করে সঙ্গে সঙ্গে এন্টিবায়োটিক দিতে হবে। একই সময়ে গর্ভনিরোধক ইনজেকশনের কার্যকারিতা বহাল রাখার জন্য তাকে আরও ১টি গর্ভনিরোধক ইনজেকশন দিয়ে দিতে হবে। অথবা অন্য কোন জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি দিতে হবে।

ফলো-আপ

গর্ভনিরোধক ইনজেকশন যে সব কেন্দ্রে প্রদান করা হয়ে থাকে যেমন- মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মডেল ক্লিনিক, জেলা হাসপাতাল, মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে, বেসরকারি সংস্থার ক্লিনিক, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, কমিউনিটি ক্লিনিক এবং স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে গ্রহীতাকে ফলো-আপ নিশ্চিত করতে হবে। কারণ ফলো-আপ এর সময় এই পদ্ধতির পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া জনিত সমস্যার সমাধান করা যায় এবং একে গ্রহণযোগ্য করে তোলা যায়। ফলো-আপের সময় পরবর্তী ইনজেকশনের সময়, স্থান ইত্যাদি সম্বন্ধে গ্রহীতাকে অবহিত করার মাধ্যমে ইনজেকশনের ড্রপ-আউটের হার পরবর্তী ইনজেকশনের সময়, স্থান ইত্যাদি সম্পর্কে গ্রতীতাকে অবহিত করার মাধ্যমে ইনজেকশনের ড্রপ-আউটের হার কমানো সম্ভব।

গর্ভনিরোধক ইনজেকশন গ্রহণকারীর কার্ড

কার্ডটি চালু করা হয়েছে মূলত: গর্ভনিরোধক ইনজেকশন ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্যের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে। কার্ডে লিপিবদ্ধ তথ্যের সাহায্যে ইনজেকশন গ্রহণকারী এবং বিভিন্ন স্তরের কর্মী ও কর্মকর্তা সহজেই জানতে পারবেন একজমন ক্লায়েন্ট লিপিবদ্ধ তথ্যের সাহায্যে ইনজেকশন গ্রহণকারী এবং বিভিন্ন স্তরের কর্মী ও কর্মকর্তা সহজেই জানতে পারবেন একজন ক্লায়েন্ট কবে থেকে কি ধরনের ইনজেকশন নিচ্ছেন, পরবর্তী ডিউ ডোজ কবে নিতে হবে ইত্যাদি। কার্ডটি ক্লায়েন্ট তার কাছে যত্ন সহকারে সংরক্ষণ করবেন এবং প্রতিবার ইনজেকশন নেয়ার সময় কর্মী বা কর্মকর্তাকে প্রদর্শন করবেন।

পরিবার কল্যাণ সহকারীর করণীয়ঃ

- কার্ড পাননি এমন পুরাতন ইনজেকশন গ্রহণকারীকে কার্ড সরবরাহের ব্যবস্থা করবেন
- কার্ডটি যত্ন সহকারে সংরক্ষণ করার জন্য ক্লায়েন্টকে পরামর্শ দিবেন।
- পরবর্তী ডিউ ডোজ দেয়ার সময় কার্ডটি নবায়ন করবেন। এবং
- কোন কারণে কার্ড হারিয়ে গেলে অথবা কার্ডের সবকটি ঘর পূরণ হয়ে গেলে নতুন কার্ডের ব্যবস্থা করবেন।

মনে রাখতে হবেঃ সকল ড্রপআউট ক্লায়েন্ট পুনরায় গর্ভনিরোধক ইনজেকশন নিতে চাইলে নতুন ক্লায়েন্ট হিসাবে গণ্য হবে।

দীর্ঘমেয়াদি পদ্ধতি (আইইউডি ও ইমপ্ল্যান্ট)

আইইউডি

আইইউডি জরায়ুতে স্থাপন উপযোগী অস্থায়ী দীর্ঘমেয়াদি গর্ভনিরোধক উপকরণ। বর্তমানে বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিতে ১০ বছর মেয়াদি কপার-টি-৩৮০এ আইইউডি নামে ব্যবহৃত হচ্ছে।

যাদের জন্য প্রযোজ্যঃ

- যে সব মহিলার অন্ততঃ একটি জীবিত সন্তান আছে এবং দীর্ঘ দিনের জন্য গর্ভরোধ করতে চান।
- যে সব মহিলা হরমোন সমৃদ্ধ পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেন না।

যাদের জন্য প্রযোজ্য নয়ঃ

- নব বিবাহিত দম্পতি
- সন্তান বিহীন দম্পতি
- তলপেটে প্রদাহ
- অনিয়মিত/অস্বাভাবিক রক্ত স্রাব
- জরায়ুর স্থানচ্যুতি (Uterine Prolapse)

কিভাবে কাজ করেঃ

- শুক্রকীট চলাচলে বাধা দেয় ফলে নিষিক্তকরণ হয় না।
- ফেলোপিয়ান টিউবে ডিম্ব চলাচলের গতিবৃদ্ধি করে ফলে ডিম্ব সঠিক স্থানে নিষিক্ত হতে পারে না।
- ফরেনবডি হিসেবে কাজ করে এবং জীবাণুমুক্ত প্রদাহের ফলে জরায়ুর গহ্বরে প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে, যে কারণে জরায়ুর গায়ে ভ্রুণ গ্রথিত হতে পারে না।

প্রয়োগের সময়:

- মাসিক চক্রের ১-৭দিনের মধ্যে (Interval application)
- প্রসব পরবর্তী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে (PPFP)
- পদ্ধতি পরিবর্তনের সময় (Interval application)
- গর্ভপাতের পর বা এম আর করার পর (PPFP)
- খোলার সময় পুনঃপ্রয়োগ

আইইউডি ব্যবহারের সুবিধা:

- খুবই কার্যকর
- দীর্ঘমেয়াদি
- প্রয়োগের সাথে সাথেই কার্যকর হয়
- খুলে ফেলার পরপরই গর্ভধারণক্ষমতা ফিরে আসে
- প্রসূতি মা যারা সন্তানকে বুকের দুধ পান করাচ্ছেন তারা ব্যবহার করতে পারেন, কারণ ব্যবহার করলে বুকের দুধের কোন তারতম্য হয় না।

আইইউডি ব্যবহারের অসুবিধা

- কোন কোন গ্রহীতার ক্ষেত্রে প্রথম কয়েক মাস তলপেটে ব্যথা হতে পারে
- কোন কোন গ্রহীতার ক্ষেত্রে প্রথম কয়েক মাস মাসিকের সময় রক্তস্রাব বেশি হতে পারে
- কিছু কিছু ক্ষেত্রে আইইউডি জরায়ু থেকে বের হয়ে আসতে পারে
- কদাচিৎ জরায়ু ছিদ্র হয়ে যেতে পারে
- সুতাজনিত সমস্যা হতে পারে
- যৌনরোগ এবং এইডস প্রতিরোধ করে না

গর্ভনিরোধক ইমপ্ল্যান্ট

ইমপ্ল্যান্ট শুধুমাত্র প্রজেস্টেরণ হরমোন সমৃদ্ধ অস্থায়ী দীর্ঘমেয়াদি জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি, যা মহিলাদের বাহুতে চামড়ার নিচে স্থাপন করা হয়।

ইমপ্ল্যান্টের ধরন	উপাদান	কার্যকারিতার মেয়াদ
ইমপ্ল্যানন ক্ল্যাসিক (Implanon Classic)	ইমপ্ল্যানন ক্ল্যাসিক এক রড বিশিষ্ট ৩ বছর মেয়াদি ইমপ্ল্যান্ট। ইমপ্ল্যাননে ৬৮ মিলিগ্রাম ইটোনজেস্ট্রিল ইথিনিল-ভিনাইল অ্যাসিটেট এর একটি পলিমার ক্যাপসুলের ভিতর থাকে। এটি একবার ব্যবহার উপযোগী একটি জীবাণুমুক্ত অ্যাপ্লিকেটরে প্রি-লোডেড অবস্থায় থাকে।	৩ বছর
ইমপ্ল্যানন এনএক্সটি (Implanon NXT)	ইমপ্ল্যানন এনএক্সটি ইমপ্ল্যান্ট-এর একটি নতুন ব্র্যান্ড। এটি ৩ বছর মেয়াদি এবং এতে ৬৮ মিলিগ্রাম ইটোনজেস্ট্রিল থাকে এবং একটি জীবাণুমুক্ত অ্যাপ্লিকেটরে প্রি-লোডেড অবস্থায় থাকে।	৩ বছর

ইমপ্ল্যান্টের ধরন	উপাদান	কার্যকারিতার মেয়াদ
জ্যাডেলি	জ্যাডেল দুই রড বিশিষ্ট ৫ বছর মেয়াদি ইমপ্ল্যান্ট। জ্যাডেল-এর দু'টি রডের প্রতিটিতে ৭৫ মিলিগ্রাম করে মোট ১৫০ মিলিগ্রাম লেভোনরজেস্ট্রিল থাকে। এর অন্য নাম হচ্ছে নরপ্ল্যান্ট (II)। জ্যাডেল এর দু'টি সিলিকন ক্যাপসুল (সাইলাস্টিক টিউব) ট্রকার ও ক্যাপসুল'সহ জীবানুমুক্ত প্যাকেটে থাকে।	৫ বছর

কিভাবে কাজ করে:

- জরায়ুর মুখে শ্লেষ্মা ঘন করে, যার ফলে শুক্রকীট সহজে জরায়ুতে প্রবেশ করতে পারে না।
- ডিম্বস্ফুটন বন্ধ করে।
- জরায়ুর ভিতরের ঝিল্লির বৃদ্ধি মন্থর করে বা কমিয়ে দেয়।

যাদের জন্য প্রযোজ্য:

- বিবাহিত এবং নবদম্পতি
- যারা দীর্ঘ দিনের জন্য বিরতি চান এমন দম্পতি।
- যারা বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছেন।
- যারা ইস্ট্রোজেন সমৃদ্ধ পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেন না।

যাদের জন্য প্রযোজ্য নয়:

- যে গর্ভবতী
- যকৃতের গুরুতর অসুখ
- ঘনঘন মাথা ব্যথা
- চোখের যে কোন তীব্র সুবিধা বা ঝাপসা দেখা
- অনিয়ন্ত্রিত উচ্চ রক্তচাপ
- শিরার অসুবিধা
- স্তনে চাকা

ইমপ্ল্যান্ট প্রয়োগের সময়কাল

- মাসিকের ১-৫ দিনের মধ্যে মিশ্র খাবার বড়ি গ্রহীতার ক্ষেত্রে-
  - সবচেয়ে উপযুক্ত সময় হল শেষ খাবার বড়ি (সাদা বড়ি) খাওয়ার পরদিন
  - এছাড়া সবগুলো বড়ি (আয়রনসহ) খাওয়া শেষ হলে তার পরদিন
- অন্য কোন প্রজেস্টিনসমৃদ্ধ পদ্ধতি ব্যবহারকারীর ক্ষেত্রে-
  - মিনিপিল বাদ দেয়ার দিন
  - ইমপ্ল্যান্ট খোলার দিন
  - ইনজেকশন এর মেয়াদ কার্যকর থাকা অবস্থায়
- আইইউডি খোলার দিন
- প্রসব পরবর্তী সময়ে- প্রসবের পর থেকে যে কোন সময়
- গর্ভপাত বা এমআর (MR)-এর পর পরই

স্থায়ী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি

স্থায়ী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি একটি বহুল প্রচলিত, নিরাপদ, অধিকতর কার্যকর, প্রায় পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়াবিহীন পদ্ধতি হিসাবে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। স্থায়ী পদ্ধতিতে যে সকল দম্পতির কাঙ্ক্ষিত সংখ্যক সন্তান রয়েছে এবং ভবিষ্যতে আর কোনো সন্তান নিতে চান না তাদের অপারেশনের মাধ্যমে স্থায়ীভাবে সন্তান জন্মদানের ক্ষমতা রোধ করা হয়।

১৯৬০ দশকের প্রথমদিকে বাংলাদেশে মহিলাদের জন্য স্থায়ী

পদ্ধতি টিউবেকটমি শুধুমাত্র মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসমূহে সীমিতভাবে চালু ছিল। ১৯৬৬ সাল হতে সরকার কর্তৃক সমর্থিত ও পরিচালিত মাঠভিত্তিক স্থায়ী পদ্ধতি কার্যক্রম পরিচালনা শুরু করা হয় এবং তারপর থেকে ক্রমান্বয়ে এর ব্যাপক বিস্তার ঘটে। ঐ সময় হতে পুরুষদের জন্য স্থায়ী পদ্ধতি ভ্যাসেকটমি বহুল পরিচিত পদ্ধতি হিসাবে জাতীয় পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত হয়।

বিগত ১৯৭০ দশকের শেষের দিক হতে ৮০'র দশকে বাংলাদেশে স্থায়ী পদ্ধতি সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা পায় এবং প্রতিবছরে গড়ে প্রায় ২.৫ হতে ৩.০ লক্ষ করে স্থায়ী পদ্ধতি সম্পাদিত হতো।

সাল	পুরুষ স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহীতার সংখ্যা	মহিলা স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহীতার সংখ্যা
১৯৮২-৮৪	২.১৬ লক্ষ	৩.৩৭ লক্ষ
২০০৫-০৬	৫৬,৭২০	৮৬৪৩২
২০১৫-১৬	৬৫,৯৫০	৯৩,০১৩

স্থায়ী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি এক ধরনের অপারেশন। অন্য অপারেশনের সাথে এর অনেক ব্যতিক্রম রয়েছে। স্থায়ী পদ্ধতির অপারেশন করার জন্য ডাক্তার বা সার্জনকে এ পদ্ধতির ওপর বিশেষ প্রশিক্ষণ নিতে হয়। গ্রহীতার স্বেচ্ছায় সম্মতিক্রমে অপারেশনের মাধ্যমে স্থায়ীভাবে সন্তান না হওয়ার ব্যবস্থা করা হয় বিধায় স্থায়ী পদ্ধতি-ভিএসসি (VSC- Voluntary Surgical Contraception) হিসাবেও বিশ্বব্যাপী পরিচিত।

স্থায়ী পদ্ধতি ২ (দুই) ধরনের

মহিলা স্থায়ী পদ্ধতি বা টিউবেকটমি (Tubectomy)

মহিলাদের স্থায়ী পদ্ধতিকে বলা হয় টিউবেকটমি। এই পদ্ধতিতে অপারেশনের সাহায্যে ডিম্বনালির কিছু অংশ বেঁধে কেটে ফেলে দিয়ে বা নালিপথ। ক্লিপ/রিং দিয়ে আটকিয়ে অথবা কটারি করে স্থায়ীভাবে সন্তান জন্মদানের ক্ষমতাকে প্রতিরোধ করা হয়। বিশ্ব জুড়ে মহিলাদের স্থায়ী পদ্ধতি 'টিউবাল-লাইগেশন', 'টিউবেকটমি' বা 'মিনিল্যাপ' ইত্যাদি নামে পরিচিত। তবে বাংলাদেশে 'লাইগেশন' এবং মহিলাদের 'অপারেশন' নামে বহুল প্রচলিত।

পুরুষ স্থায়ী পদ্ধতি বা ভ্যাসেকটমি (Vasectom)

পুরুষদের স্থায়ী পদ্ধতিকে বলা হয় ভ্যাসেকটমি। ভ্যাসেকটমিতে ছোট অপারেশনের মাধ্যমে শুক্রবাহী নালীর কিছু অংশ বেঁধে কেটে ফেলে দিয়ে বা কটারি করে স্থায়ীভাবে সন্তান জন্মদানের ক্ষমতাকে বন্ধ করে দেয়া হয়। পুরুষদের স্থায়ী পদ্ধতি বাংলাদেশে 'ভ্যাসেকটমি' বা 'পুরুষ-স্থায়ী পদ্ধতি' নামে পরিচিত। ইদানিং ছুরি ব্যবহার না করে একটি ছোট ছিদ্র করে এই অপারেশনটি করার ফলে এটি ছুরিবিহীন ভ্যাসেকটমি বা এনএসভি (No Scalpel Vasectomy) নামে পরিচিতি লাভ করছে।

স্থায়ী পদ্ধতি যাদের জন্য উপযুক্ত

- যে সকল দম্পতির ০২ (দুই) জন জীবিত সন্তান আছে এবং ছোট সন্তানের বয়স কমপক্ষে ০১ (এক) বছর তাদের স্বামী বা স্ত্রী এর যে কোন একজনকে যথাক্রমে ভ্যাসেকটমি বা টিউবেকটমি সেবা প্রদান করা যাবে
- দ্বিতীয় সিজারিয়ান অপারেশনের সময় দম্পতির সম্মতিতে স্ত্রীকে টিউবেকটমি সেবা প্রদান করা যাবে
- যে সকল দম্পতির ০২ (দুই) জন জীবিত সন্তান আছে এবং স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই স্থায়ী পদ্ধতি পরবর্তী সকল সুবিধা ও অসুবিধা বুঝে-শুনে যৌথভাবে স্বেচ্ছায় পদ্ধতি গ্রহণে সম্মতি প্রদান করলে যে কোন একজনকে ভ্যাসেকটমি বা টিউবেকটমি সেবা প্রদান করা যাবে

স্থায়ী পদ্ধতির অপারেশন কোথায় করা হয়

স্থায়ী পদ্ধতি বিনা খরচে সকল সরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকে, সরকার অনুমোদিত এনজিও এবং বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসক দ্বারা সম্পাদন করা হয়।

দেশব্যাপী যে সকল ক্লিনিক/হাসপাতালে টিউবেকটমি ও ভ্যাসেকটমির (এনএসভি) অপারেশন করা হয়ে থাকে-

- মান-উন্নীত ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র
- সকল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স
- সকল মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র
- জেলা সদর হাসপাতাল
- মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং মডেল পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক বা এমসিএইচ-এফপি ক্লিনিক
- অন্যান্য সরকারি ও আর্মি হাসপাতালের এমসিএইচ-এফপি ক্লিনিক
- সরকার অনুমোদিত এনজিও হাসপাতাল ও ক্লিনিক
- বেসরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিক
- সকল জরুরি প্রসূতি সেবাকেন্দ্র (ইওসি) এবং
- বিশেষ সেবা কার্যক্রম ক্যাম্প সংগঠনের মাধ্যমে দুর্গম, দূরবর্তী, চর, কম সুবিধাসম্পন্ন এলাকায় এবং শহরাঞ্চলের বস্তিতে

স্থায়ী পদ্ধতির অপারেশন করার জন্য প্রয়োজনীয় ভৌত সুবিধাসমূহ

পরিবার পরিকল্পনার স্থায়ী পদ্ধতির একটি আদর্শ সেবাদান কেন্দ্রে/ক্লিনিকে অপারেশনের জন্য নিম্নে বর্ণিত কক্ষ/স্থানের প্রয়োজন। যেমন-

১. ওয়েটিং রুম/অভ্যর্থনা কক্ষ

২. কাউন্সেলিং কক্ষ।

৩. শারীরিক পরীক্ষা ও ল্যাবরেটরি পরীক্ষার কক্ষ

৪. অটোক্লেভিং বা জীবাণুমুক্তকরণ স্থান

৫. অপারেশন পূর্বপ্রস্তুতি কক্ষ ও হাত ধোয়ার জায়গা

৬. অপারেশন কক্ষ

জরুরি গর্ভনিরোধক বড়ি (Emergency Contraceptive Pill - ECP)

জরুরি গর্ভনিরোধক বড়ি বা ইমারজেন্সি কন্ট্রাসেপটিভ পিল (ECP) হলো জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির ভুল ব্যবহার, ব্যবহার ব্যর্থ হলে বা ব্যবহার না করে অরক্ষিত (Unprotected sex) বা অপ্রতিরোধ্য (Irresistible) যৌনমিলন হয়ে যাওয়ার কারণে অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভরোধ করার একটি প্রক্রিয়া। বর্তমান পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিতে ইসিপি হলো দুই ডোজের একটি খাবার বড়ি (পস্টিনর-২) যার প্রতি ডোজে ০.৭৫ মি.গ্রা. লেভোনরজেস্ট্রিল থাকে। অরক্ষিত যৌনমিলনের ৭২ ঘণ্টার মধ্যে প্রথম ডোজের ১টি বড়ি এবং ১ম ডোজ গ্রহণের ১২ ঘণ্টা পর দ্বিতীয় ডোজের ১টি বড়ি খেতে হয়। একটিমাত্র ডোজের ক্ষেত্রে বড়িতে ১.৫ মি.গ্রা. লেভোনরজেস্ট্রিল থাকে।

জরুরি গর্ভনিরোধক বড়ি

যেসকল পরিস্থিতিতে জরুরি গর্ভনিরোধক বড়ি (ইসিপি) ব্যবহার করা যায়-

- যদি যৌনমিলনের সময় জন্মনিয়ন্ত্রণের কোনো পদ্ধতি ব্যবহার করা না হয়;
- যদি জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সঠিকভাবে কাজ না করে বা ভুল নিয়মে পদ্ধতিটি ব্যবহার করা হয়, যেমন-কনডম ছিদ্র হয়ে যাওয়া, ফেটে যাওয়া বা স্থানচ্যুত হওয়া;
- পরপর দুই দিন মিশ্র হরমোনযুক্ত খাবার বড়ি খেতে ভুলে যাওয়া;
- জন্মনিরোধ ইনজেকশন দেওয়ার তারিখ হতে চার সপ্তাহের বেশি দেরি হওয়া;
- আইইউডি সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে খুলে যাওয়া;
- অনুর্বর দিন গণনায় ভুল করে উর্বরকালীন সময়ে যৌনমিলন করা;
- আযল পদ্ধতি ব্যবহার করা।

মাসিক নিয়মিতকরণ (Menstrual Regulation - MR)

মাসিক নিয়মিতকরণ বা এমআর একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে যেসকল নারীর ৬-১২ সপ্তাহ পর্যন্ত মাসিক বন্ধ আছে তাদের মাসিক নিয়মিতকরণ প্রক্রিয়াকে মাসিক নিয়মিতকরণ বা এমআর (MR) বলে। পৃথিবীতে প্রতিবছর প্রায় ২৫ মিলিয়ন এমআর হচ্ছে যার প্রায় সবটাই হচ্ছে উন্নয়নশীল দেশে। মাতৃমৃত্যুর শতকরা ৪.৭ ভাগ থেকে ১৩.২ ভাগ মৃত্যু হচ্ছে অনিরাপদ এমআর করার কারণে। বাংলাদেশে ২০১৪ সালে ৪ লক্ষ ৩০ হাজার এমআর করা হয়েছে যার ৪২% করা হয়েছে স্বাস্থ্য সেবাকেন্দ্রে। (সূত্র: https://www.guttmacher.org/fact-sheet/menstrual-regulation-unsafe-abortion-bangladesh)

নিরাপদ মাসিক নিয়মিতকরণ (Safe Menstrual Regulation)

এমআর এর উপর প্রশিক্ষণ আছে এমন ডাক্তার (নিবন্ধনকৃত), প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নার্স, সাব-অ্যাসিসটেন্ট কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার (SACMO), মিডওয়াইফ এবং পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা (FWV)-এর মাধ্যমে ন্যূনতম চিকিৎসা মান বজায় রেখে এমআর সম্পন্ন করাই হচ্ছে নিরাপদ মাসিক নিয়মিতকরণ।

সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী কেবলমাত্র প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ডাক্তার (নিবন্ধনকৃত) মাসিক বন্ধের ১২ সপ্তাহ পর্যন্ত এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নার্স, সাব এ্যাসিসটেন্ট কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার (SACMO) মিডওয়াইফ এবং পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা (FWV) মাসিক বন্ধের ১০ সপ্তাহ পর্যন্ত সার্জিক্যাল মাসিক নিয়মিতকরণ (MR) সেবা দিতে পারবেন। তবে ঔষধের (মেডিসিন) মাধ্যমে (এমআরএম) সর্বোচ্চ ৯ সপ্তাহ পর্যন্ত করা যায়। বাংলাদেশের গর্ভপাত সংক্রান্ত আইনের পেনাল কোড-১৮৬০ এর ৩১২-৩১৬ ধারা অনুযায়ী কেবলমাত্র নারীদের জীবন রক্ষার্থে গর্ভপাত অনুমোদিত। তবে এমআর কখনো পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির বিকল্প নয়।

ঔষধের সাহায্যে (এমআরএম): মিফিপ্রিস্টোন (Mifepristone) ও মিসোপ্রোস্টল (Misoprostol) এর সমন্বয়ে ১টি ২০০ মি.গ্রা. মিফিপ্রিস্টোন (Mifepristone) ও ৪টি ২০০ মাইক্রোগ্রামের মিসোপ্রোস্টল (Misoprostol) এর সাহায্যে।

সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী কেবলমাত্র প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ডাক্তার, নার্স, সাব-অ্যাসিসটেন্ট কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার, মিডওয়াইফ এবং পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা জীবন রক্ষার্থে মাসিক নিয়মিতকরণ (MR) সেবা দিতে পারবেন। পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির বিকল্প হিসেবে এমআর করা যাবে না।

অনিরাপদ মাসিক নিয়মিতকরণ (UnSafe Menstrual Regulation)

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে অদক্ষ সেবাপ্রদানকারী এবং ন্যূনতম চিকিৎসা মান বজায় না রেখে এমআর সম্পন্ন করাই হচ্ছে অনিরাপদ এমআর।

অনিরাপদ মাসিক নিয়মিতকরণের কুফলসমূহ

- তলপেটে ব্যথা ও ইনফেক্শন বা প্রদাহ,
- যোনিপথে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ,
- জীবাণু দ্বারা সংক্রমণ,
- যোনিপথে দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব,
- জ্বর,
- জরায়ু ছিদ্র হওয়া,
- বন্ধ্যাত্ব,
- এমনকি মৃত্যুর আশঙ্কাও থাকে।

কখন এমআর করা যায় না-

- অসম্পূর্ণ গর্ভপাত হলে
- হৃদরোগ থাকলে
- মারাত্মক হাঁপানী, যক্ষ্মা, ফুসফুসের সমস্যা ইত্যাদি থাকলে
- যকৃতের (Liver) অসুখ থাকলে
- অনিয়ন্ত্রিত বহুমূত্র (Diabetes) থাকলে
- ১২ সপ্তাহের বেশি সময় মাসিক বন্ধ থাকলে
- *রক্তস্রাব সংক্রান্ত সমস্যার ইতিহাস থাকলে*
- পেলভিক ইনফেক্শন থাকলে
- জরায়ুতে টিউমার থাকলে কিংবা জরায়ুর আকার ১০ সপ্তাহের মত বড় মনে হলে
- অতিরিক্ত রক্তস্বল্পতা
- তলপেটে তীব্র ব্যথা থাকলে।

নিরাপদ এমআর সেবাকেন্দ্রসমূহ

- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (BSMMU);
- মোহাম্মদপুর ফার্টিলিটি সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার (MFSTC),
- মাতৃসদন ও শিশুস্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (MCHTI) এবং শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান (ICMH), মাতুয়াইল
- মাতৃসদন ও শিশুস্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (MCHTI) এবং মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, আজিমপুর
- লালকুটি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, মিরপুর-১
- মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসমূহ (সরকারি এবং সরকার অনুমোদিত বেসরকারি মালিকাধীন)
- জেলা সদর হাসপাতালসমূহ
- মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রসমূহ
- উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স
- ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রসমূহ
- সরকার অনুমোদিত এনজিও ক্লিনিক, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/হাসপাতাল/ক্লিনিক

এমআর পরবর্তী নির্দেশনাবলী

- গ্রহীতার কিছুক্ষণ সেবাকেন্দ্রে বিশ্রাম নেওয়া;
- কোনো ভারি কাজ না করা;
- পরিষ্কার পরিছন্ন থাকা;
- স্বাস্থ্যসম্মত প্যাড ব্যবহার করা;
- দু'সপ্তাহ পর্যন্ত সহবাস থেকে বিরত থাকা;
- নিয়মিত ঔষধ সেবন করা;
- এমআর পরবর্তী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ করা;
- ফলো-আপ ভিজিটে আসা।

এমআর পরবর্তী পরিবার পরিকল্পনা

এমআর-এর সাথে সাথে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি শুরু করা উচিত। কারণ-

- পুনরায় গর্ভধারণের ঝুঁকি থাকে;
- এমআর-এর ১১তম দিনে ডিম্বস্ফুটন হতে পারে;
- শতকরা ৭৫ ভাগ নারীর ৬ সপ্তাহের মধ্যে ডিম্বস্ফুটন হয়।

মেডিসিন বা ঔষধের মাধ্যমে মাসিক নিয়মিতকরণ (MRM)

MRM হচ্ছে একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে যেসকল নারীর ৬-৯ সপ্তাহ পর্যন্ত মাসিক বন্ধ আছে তাদের মাসিক নিয়মিতকরণ বুঝায়। এই পদ্ধতিতে ৬ সপ্তাহ থেকে ৯ সপ্তাহ পর্যন্ত মিফেপ্রিস্টোন (Mifepristone) ও মিসোপ্রোস্টল (Misoprostol) ঔষধ ব্যবহার করে মাসিক নিয়মিতকরণ করা যায়।

মিফেপ্রিস্টোন (Mifepristone) যেভাবে কাজ করে-

- জরায়ুর মুখকে নরম করে;
- জরায়ুকে খুব সহজেই সংকুচিত করার জন্য প্রস্তুত করে এবং যার ফলশ্রুতিতে রক্তপাত হয়;
- মিফেপ্রিস্টোন ঔষধ সেবনের ১৫ মিনিটের মধ্যে এর কার্যকারীতা শুরু হয়ে যায়।

এমআরএম ব্যবস্থাপনা যাদের দেওয়া যাবে না (Contraindications)

- মাসিক বন্ধ ৬ সপ্তাহের কম বা ৯ সপ্তাহের বেশি হলে, জরায়ুর আকার ৯ সপ্তাহের গর্ভকালের বেশি হলে;
- মারাত্মক রক্তস্বল্পতা থাকলে;
- ব্লিডিং ডিজঅর্ডার থাকলে;
- একটোপিক প্রেগন্যান্সি সন্দেহ বা নিশ্চিত হলে;
- মিফেপ্রিস্টোন (Mifepristone) অথবা মিসোপ্রোস্টল (Misoprostol) ব্যবহারে এলার্জির ইতিহাস থাকলে;
- এন্টিকোগুলেন্ট অথবা স্টেরয়েড ঔষধ গ্রহণ করলে;
- এছাড়াও যদি নিম্নলিখিত স্বাস্থ্য সমস্যা থাকে তবে তাদেরও এমআরএম দেওয়া যাবে না-
- জটিল পেলভিক সংক্রমণের (Pelvic Inflammatory Diseases - PID) লক্ষণ/চিহ্ন থাকলে
- তলপেটে অস্বাভাবিক ব্যথা
- জ্বর
- দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব
- সার্ভিক্যাল মোশন টেন্ডারনেস
- পেলভিক এলাকায় চাকা।

চিত্র: দু'সপ্তাহ পর্যন্ত সহবাস থেকে বিরত থাকা

চিত্র: এমআর পরবর্তী পরিবার পরিকল্পনা

চিত্র: ফলো-আপ ভিজিটে আসা

এমআরএম-এর সুবিধা

- সফলতার হার ৯৫-৯৯%
- যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ঝামেলা নেই
- ব্যবস্থাপনার কিছু অংশ বাড়িতে সম্পন্নযোগ্য।

এমআরএম-এর জটিলতা

ক) অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ (২ ঘণ্টায় দুই বা তার অধিক প্যাড রক্তে ভিজে গেলে) হলে অবশ্যই সেবাকেন্দ্রে সেবাপ্রদানকারীর সাথে যোগাযোগ করতে হবে।

খ) মাসিক বন্ধ চলমান থাকা (Continuing Pregnancy): ১-২% ক্ষেত্রে

গ) অসম্পূর্ণ এমআরএম (Incomplete MRM)

অসম্পূর্ণ এমআরএম-এর লক্ষণসমূহ

- রক্তক্ষরণের সাথে গর্ভপাতের অংশ থাকতে পারে নাও থাকতে পারে;
- পেটে অস্বাভাবিক ব্যথা;
- জরায়ুর মুখ খোলা থাকা।

ঘ) সংক্রমণ (Infection)-এমআরএম-এ সংক্রমণের হার কম;

সংক্রমণের লক্ষণসমূহ

- ক্রমাগত জ্বর যা ১০০.৪ ডিগ্রী ফারেনহাইট বা তার বেশি এবং ২৪ ঘণ্টার বেশি স্থায়ী;
- ক্রমাগত তলপেটে ব্যথা;
- যোনীপথে দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব।

ক্লায়েন্ট রেফার

গ্রহীতাকে অবশ্যই অতি দ্রুত সেবাকেন্দ্রে যেতে হবে অথবা জরুরি চিকিৎসা নিতে হবে যদি-

- যোনীপথে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ অথবা বড় সাইজের রক্তের চাকা বের হয়;
- দীর্ঘ সময় ধরে যোনীপথে প্রচুর রক্তক্ষরণ হলে;
- প্রচণ্ড কামড়ানো ব্যথা যা ব্যথানাশক ঔষধ দিয়ে কমানো যায় না;
- পেটে অস্বাভাবিক ব্যথা থাকলে ও ক্রমাগত তলপেটে ব্যথা হলে এবং বমি বমি ভাব হলে;
- ক্রমাগত জ্বর যা ১০০.৪ ডিগ্রী ফারেনহাইট বা তার বেশি এবং ২৪ ঘণ্টার বেশি স্থায়ী হলে;
- ৬ ঘণ্টা বা তার বেশি সময় ধরে জ্বর বা শরীর ম্যাজ ম্যাজ করা অথবা শরীর ব্যথা হলে।

গর্ভপাত পরবর্তী সেবা (Post Abortion Care- PAC)

গর্ভপাতজনিত জটিলতা মাতৃমৃত্যু ও অসুস্থতার (Maternal Mortality and Morbility) প্রধান কারণ। অনিরাপদ গর্ভপাত (Unsafe abortion), অসম্পূর্ণ গর্ভপাত (Incomplete abortion), এমনকি নিরাপদ গর্ভপাতজনিত (Safe abortion) জটিলতার জরুরি চিকিৎসা প্রয়োজন।

গর্ভপাত পরবর্তী সেবা বা PAC হচ্ছে অসম্পূর্ণ এবং অনিরাপদ গর্ভপাত (Incomplete unsafe abortion) সংশ্লিষ্ট জটিলতা থেকে ইনজুরি ও মৃত্যুর হার কমানোর একটি ব্যবস্থা। এটি গর্ভপাতজনিত জটিলতার ব্যবস্থাপনা বা সেবা।

PAC সার্ভিসের গুরুত্ব

- PAC একটি জীবন রক্ষাকারী সেবা (Life saving services)
- PAC সার্ভিসের মাধ্যমে গর্ভপাত সংশ্লিষ্ট জটিলতাজনিত মৃত্যু প্রতিরোধ করা যায়
- মানসম্মত PAC সার্ভিসের মাধ্যমে অধিকাংশ অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণ ও গর্ভপাত প্রতিরোধ করা যায়
- মানসম্মত PAC সার্ভিস (much more accessible) সহজপ্রাপ্য করার টেকনোলজি আমাদের আছে।

অধ্যায়-৮

প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ, যৌনবাহিত সংক্রমণ এবং এইচআইভি ও এইডস; স্তন ও জরায়ুমুখের ক্যান্সার

প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ, যৌনবাহিত সংক্রমণ এবং এইচআইভি ও এইডস; স্তন ও জরায়ুমুখের ক্যান্সার

প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ (Reproductive Tract Infection-RTI)

প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ বলতে নারী পুরুষের প্রজনন অঙ্গ ও প্রজনন পথের সব সংক্রমণকে বোঝায়। প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ বিভিন্ন ধরনের জীবাণু দ্বারা সংক্রমণের সমষ্টি- যা প্রজননতন্ত্রের বিভিন্ন অঙ্গে হয়ে থাকে। এগুলি যৌনবাহিত অথবা অভ্যন্তরীণ সংক্রমণও হতে পারে। প্রজননতন্ত্রের পরিবেশগত পরিবর্তনের জন্য যে সংক্রমণ ঘটে তা সাধারণত যৌনমিলন বা সঙ্গীর মধ্যে ছড়ায় না, যেমন- প্রজননতন্ত্রে অবস্থিত স্বাভাবিক জীবাণুর বৃদ্ধি, কোনো মেডিকেল প্রযুক্তি/প্রক্রিয়া বা ক্লিনিক্যাল পদ্ধতি করতে গিয়ে যন্ত্রপাতি বা পরিবেশ জীবাণুমুক্ত না করার জন্য যে সংক্রমণ হয়ে থাকে, অথবা অনিরাপদ/সংক্রমিত গর্ভপাত এবং অপরিচ্ছন্ন প্রসবের কারণে সংক্রমণ।

যৌনবাহিত সংক্রমণ (Sexually Transmitted Infection- STI)

যৌন সম্পর্কের মাধ্যমে যেসকল সংক্রমণ বা রোগ ছড়ায় সেগুলো যৌনবাহিত সংক্রমণ বা যৌনবাহিত রোগ। যৌনবাহিত সংক্রমণ বিভিন্ন ধরনের জীবাণুর সংক্রমণের সমষ্টি যা মূলত যৌনমিলন অথবা সংক্রমিত সঙ্গীর সাথে ঘনিষ্ট সংস্পর্শের মাধ্যমে ছড়ায়। এইসব সংক্রমণের মধ্যে রয়েছে ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, প্রোটোজোয়া, স্পাইরোকীট এবং পরজীবিঘটিত সংক্রমণ।

প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ ও যৌনবাহিত সংক্রমণ-এর মধ্যে পার্থক্য

প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ ও যৌনবাহিত সংক্রমণের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ বলতে প্রজনন অঙ্গের সব সংক্রমণকে বোঝায়। এই সংক্রমণ যৌনবাহিত হতে পারে আবার নাও হতে পারে। সব যৌনবাহিত সংক্রমণ বা রোগে প্রজননতন্ত্র সংক্রমিত হয় না। স্বাভাবিক অবস্থায় যোনিপথে অবস্থিত Flora এর ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার কারণে অথবা জীবাণু সংক্রমিত যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামাদি ব্যবহার করার ফলে প্রজননতন্ত্রের এই সংক্রমণ হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে, Human Immuno-Deficiency Virus (HIV), Hepatitis-B, C, D ইত্যাদি যৌনবাহিত সংক্রমণ বা রোগ। এক্ষেত্রে প্রজননতন্ত্র আক্রান্ত হয় না।

প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ ও যৌনবাহিত সংক্রমণের শ্রেণিবিভাগ

ক. সংক্রমণের প্রক্রিয়া অনুযায়ী তিনভাগে ভাগ করা যায়-

১। প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ কিন্তু যৌনবাহিত নয়

২। যৌনবাহিত প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ

৩। যৌনবাহিত কিন্তু প্রজননতন্ত্র সংক্রমিত হয় না

খ. ক্লিনিক্যালি দুইভাগে ভাগ করা যায়-

১। ক্ষতযুক্ত

২। ক্ষতহীন

ক. ১। প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ কিন্তু যৌনবাহিত নয়

প্রজননতন্ত্রের কিছু কিছু সংক্রমণ যৌন সম্পর্কের মাধ্যমে হয় না। উদাহরণ স্বরূপ:

- ক্যানডিডিয়াসিস/মোনিলিয়াসিস
- ব্যাকটেরিয়াল ভ্যাজাইনোসিস
- জীবাণুযুক্ত যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামাদি ব্যবহারের ফলে তলপেটের সংক্রমণ (Iatrogenic Pelvic Inflammatory Disease)

ক. ২। যৌনবাহিত প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ

ক্ষতযুক্ত যৌনবাহিত প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ

- হারপিস জেনিটালিয়া
- সিফিলিস
- শ্যাংক্রয়েড (Chancroid)
- গ্রানুলোমা ইনগুইনেল (Granuloma Inguinale)
- লিম্ফোগ্রানুলোমা ভেনোরাম (Lymphogranuloma Venorum)

ক্ষতবিহীন যৌনবাহিত প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ:

- ট্রাইকোমোনিয়াসিস (Trichomoniasis)
- গণোরিয়া (Gonorrhoea)
- ক্ল্যামাইডিয়া (Chlamydia)।

ক. ৩। যৌনবাহিত কিন্তু প্রজননতন্ত্র সংক্রমিত হয় না

কিছু কিছু যৌনবাহিত সংক্রমণ/রোগের ফলে প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ নাও হতে পারে। যেমন-

হেপাটাইটিস বি, সি এবং ডি (Hepatitis B, C and D)
এইচআইভি ও এইডস (HIV and AIDS)
খোস পাঁচড়া-সব সময় নয় (Scabies)

যৌনবাহিত সংক্রমণ ও এইচআইভি ছড়ানোর সাধারণ কারণ

যৌনবাহিত সংক্রমণ ও এইচআইভি অনেক উপায়ে ছড়াতে পারে যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

১. যৌনমিলন: অনিরাপদ যৌনমিলন যৌনবাহিত রোগ সংক্রমণ ছড়ানোর প্রধান মাধ্যম। এর মধ্যে পুরুষাঙ্গ- যোনী, পুরুষাঙ্গ-পায়ু, পুরুষাঙ্গ-মুখ এবং যোনী- যোনী যৌনমিলনের মাধ্যমে ছড়াতে পারে।

২. শিরায় মাদক ব্যবহার: এইচআইভি, হেপাটাইটিস-বি ও সি সুঁচ আদান-প্রদান ও দেহ রসের মাধ্যমে ছড়ায়

৩. যৌনমিলনের সময় ও শারীরিক সংস্পর্শে: যৌনাঙ্গে ক্ষত তৈরি করা রোগ, যেমন-শ্যাংক্রয়েড ও হারপিস (পেরিনিয়াল ও স্ক্রোটাল রিজিয়নে) কনডম সুরক্ষিত যৌনমিলনের সময়েও ছড়াতে পারে।

৪. রক্ত ও রক্তজাত দ্রব্যের মাধ্যমে: অপরীক্ষিত রক্ত ও রক্তজাত দ্রব্যের মাধ্যমে এইচআইভি, হেপাটাইটিস ও সিফিলিস ছড়াতে পারে।

৫. চিকিৎসা পদ্ধতি ও ধারালো যন্ত্রপাতির মাধ্যমে: জীবাণুযুক্ত সিরিঞ্জ ব্যবহার, দুর্ঘটনাবশত: সিরিঞ্জের সুঁচ শরীরে প্রবেশ করলে এবং অস্ত্রোপচারের সময় জীবাণুযুক্ত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করলে কোনো কোনো যৌনবাহিত রোগ ছড়াতে পারে।

৬. গর্ভকালীন: গর্ভকালীন সময়ে এইচআইভি ও সিফিলিস মায়ের কাছ থেকে শিশুর মধ্যে ছড়াতে পারে।

৭. প্রসবের সময়: অপথালমিয়া নিওনেটোরাম ও এইচআইভি প্রসবের সময় মায়ের কাছ থেকে শিশুর মধ্যে ছড়াতে পারে।

৮. মায়ের দুধের মাধ্যমে: মায়ের দুধের মাধ্যমে এইচআইভি মায়ের থেকে শিশুর মধ্যে ছড়াতে পারে।

চিত্র: যৌনবাহিত সংক্রমণ ও এইচআইভি ছড়ানোর সাধারণ কারণ

যেসব কারণ যৌনবাহিত রোগ (STI) এবং এইচআইভি (HIV) সংক্রমণ বিস্তারে প্রভাব রাখছে-

- সঠিক তথ্য না জানা ও অসচেতনতা
- নিরাপদ যৌন আচরণ মেনে না চলা। যেমন- কনডম ব্যবহার না করা, একাধিক যৌনসঙ্গী, যৌনবাহিত রোগের উপযুক্ত চিকিৎসা গ্রহণে বিলম্ব করা
- যৌনসঙ্গী সনাক্তকরণ ও চিকিৎসা করাতে ব্যর্থ হওয়া
- চিকিৎসার সঠিক নিয়ম পুরোপুরি মেনে না চলা
- ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া

চিত্র: সঠিক তথ্য না জানা ও আসচেতনতা

যৌনবাহিত রোগের সাধারণ উপসর্গসমূহ

- যোনী বা পুরুষাঙ্গ দিয়ে স্রাব যাওয়া
- মূত্রনালীর নিঃসরণ
- প্রস্রাবে ব্যথা এবং জ্বালাপোড়া
- যৌনাঙ্গে চুলকানি
- তলপেটে ব্যথা
- কুঁচকি ফুলে যাওয়া এবং ক্ষত
- ব্যথাযুক্ত ও ব্যথামুক্ত যৌনাঙ্গের ক্ষত
- ফুসকুড়ি, ফোস্কা ও লাল স্ফীত যৌনাঙ্গ
- জরায়ু মুখে স্রাব
- অণ্ডকোষ ফোলা
- সহবাসে ব্যথা
- হাত ও পায়ের পাতাসহ শরীরে ফুসকুড়ি।

যৌনবাহিত রোগ সংক্রমণের দীর্ঘমেয়াদি পরিণতি

ক) শারীরিক পরিণতি

নারীদের

- বন্ধ্যাত্ব
- দীর্ঘমেয়াদি পেটে ব্যথা
- এক্টোপিক প্রেগনেন্সি
- জরায়ু-মুখের ক্যান্সার
- সময়ের আগে প্রসব
- গর্ভপাত
- এইচআইভি সংক্রমণের ঝুঁকি।

পুরুষদের

- মূত্রনালী সরু হয়ে যাওয়া
- বন্ধ্যাত্ব
- এইচআইভি সংক্রমণের ঝুঁকি।

নবজাতকের জন্য

- জন্মগত অস্বাভাবিক গঠন
- অন্ধত্বের ঝুঁকিসহ চোখের সংক্রমণ
- এইচআইভি সংক্রমণের ঝুঁকি।

খ) সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিণতি

- ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক সমস্যা
- সামাজিক হয়রানি
- বন্ধ্যাত্বের কারণে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া, বিবাহ বিচ্ছেদ
- চিকিৎসার খরচ বৃদ্ধি
- কর্মক্ষম সময়ের অপচয়
- সামাজিক বৈষম্যের শিকার হওয়া।

প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ ও যৌনবাহিত সংক্রমণ প্রতিরোধ

সংক্রমণ প্রতিরোধ নিম্নোক্ত উপায়ে করা যেতে পারে:

- যুব সমাজ, নারী এবং পুরুষদের প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ/যৌনবাহিত সংক্রমণের কারণ, ভয়াবহতা এবং এর প্রতিরোধ ও প্রতিকার ব্যবস্থা সম্বন্ধে তথ্য ও শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করা।
- নিরাপদ যৌন আচরণে উৎসাহী করা। যেমন-
  - বিশ্বস্ত এবং আক্রান্ত নয়, এমন সঙ্গীর সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা
  - সঠিকভাবে এবং সবসময়ই কনডম ব্যবহার করা
  - একজন সঙ্গীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকা।
- আক্রান্ত রোগীর সংক্রমণ বিস্তার রোধ করার লক্ষ্যে সঠিক সময়ে রোগ নিরুপণ ও চিকিৎসাকে সহজলভ্য, গ্রহণযোগ্য ও কার্যকর করাই হলো এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য।

এইচআইভি ও এইডস

এইচআইভি (HIV)

এইচআইভি হচ্ছে একটি অতি সুক্ষ জীবাণু যা খালি চোখে দেখা যায় না। এই জীবাণুর মাধ্যমে AIDS হয়। এইচআইভি (HIV) একটি ভাইরাস। ইংরেজিতে Human Immunodeficiency Virus নামক ভাইরাসের সংক্ষিপ্ত নাম এইচআইভি। এই ভাইরাসে সংক্রমিত হলে সংক্রমিত ব্যক্তির দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ধীরে ধীরে কমে যায়। যার পরিণতি মৃত্যু। এইচআইভি দ্বারা আক্রান্ত রোগের বিশেষ আরও একটি দিক হলো একবার আক্রান্ত হলে তা আর সুস্থ হওয়ার উপায় নেই।

এইডস (AIDS)

এইডস হচ্ছে এইচআইভি দ্বারা সংক্রমিত একটি মারাত্মক যৌনবাহিত সংক্রামক রোগ। এরোগ কতগুলো উপসর্গ ও লক্ষণের সমষ্টি। ইংরেজিতে Acquired Immune Deficiency Syndorme -নামের রোগের সংক্ষিপ্ত নামকরণ হলো এইডস।

এইডস হচ্ছে এইচআইভি (রেট্রো ভাইরাস) দ্বারা সৃষ্ট এমন একটি সংক্রামক রোগ যাতে আক্রান্ত ব্যক্তির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এর ফলে আক্রান্ত ব্যক্তির দেহ যেকোনো সংক্রমণই প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হয়। এই রোগের নানা উপসর্গ ও লক্ষণ দেখা দেয় বলে একে সিনড্রোম বলে।

মানবদেহে এইচআইভি (জীবাণু) কোথায় অবস্থান করে

মূলত মানুষের চারটি উপাদানে এইডস-এর জীবাণু এইচআইভি অবস্থান করে-

- মানুষের রক্তে
- বীর্যে
- যোনীরসে
- মায়ের দুধে (স্বল্প পরিমাণে)

কাদের বেশি এইডস হওয়ার ঝুঁকি থাকে

- যৌনকর্মী
- বহুগামী পুরুষ বা নারী
- শিরায় ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদকদ্রব্য গ্রহণকারী ব্যক্তি
- সমকামী পুরুষ বা নারী
- অনিরাপদ যৌন জীবন যাপনে অভ্যস্ত পুরুষ বা নারী।

এইডস-এর লক্ষণ ও উপসর্গ

এইডস রোগের আলাদা কোনো লক্ষণ নেই। প্রতিরোধ ক্ষমতা ধ্বংস হওয়ার ফলে বিভিন্ন রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেতে থাকে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এইডস নিরূপণে কিছু লক্ষণ নির্ধারণ করেছে। এ রোগের প্রধান এবং সাধারণ লক্ষণসমূহ নিম্নরূপ:

প্রধান লক্ষণ:

- শরীরের ওজন অস্বাভাবিকভাবে কমে যাওয়া (শরীরের ওজন শতকরা ১০ ভাগের বেশি কমে যাওয়া)
- অনেকদিন বা এক মাসের বেশি সময় ধরে জ্বর
- দীর্ঘদিন বা এক মাসের বেশি সময় ধরে অবিরাম ডায়রিয়া যা সাধারণ চিকিৎসায় ভালো হয় না।

চিত্র: শরীরের ওজন অস্বাভাবিকভাবে কমে যাওয়া

চিত্র: অনেকদিন বা এক মাসের বেশি সময় ধরে জ্বর

সাধারণ লক্ষণ:

- এক মাসের বেশি সময় ধরে একটানা কাশি, নিউমোনিয়া এবং ফুসফুসের প্রদাহ;
- সাধারণ চুলকানিসহ চামড়ার প্রদাহ;
- মুখে বা মুখ গহ্বরে ঘা/ছত্রাকের সংক্রমণ;
- হারপিস সিমপ্লেক্স সৃষ্ট ক্ষতের ক্রমে ক্রমে বিস্তার লাভ;
- শরীরের বিভিন্ন স্থানে লসিকা গ্রন্থি ফুলে যায় এবং ঘা ও ক্যান্সার হয়।

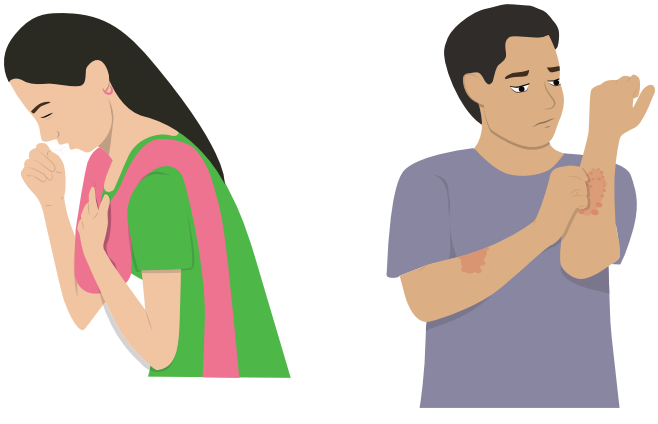

চিত্র: এক মাসের বেশি সময় ধরে একটানা কাশি কাশি, সাধারণ চুলকানিসহ চামড়ার প্রদাহ।

এইচআইভি যেভাবে ছড়ায়-

- সংক্রমিত ব্যক্তির সঙ্গে অনিরাপদ যৌনমিলনের মাধ্যমে (এইচআইভি সংক্রমণের শতকরা ৯০ ভাগই ঘটে যৌনক্রিয়ার মাধ্যমে);
- সংক্রমিত ব্যক্তির রক্ত গ্রহণ বা প্রদানের মাধ্যমে;
- সংক্রমিত ব্যক্তির ব্যবহৃত সুঁচ বা সিরিঞ্জ জীবাণুমুক্ত না করে ব্যবহার করলে;
- এইচআইভি সংক্রমিত মায়ের গর্ভে থাকাকালীন, প্রসবকালীন ও বুকের দুধ খাওয়ানোর সময় শিশুর দেহে সংক্রমিত হতে পারে।

এইচআইভি যেভাবে ছড়ায় না

- সংক্রমিত/আক্রান্ত ব্যক্তির শ্বাস-প্রশ্বাস, হাঁচি, কাশি বা থুথুর মাধ্যমে এইচআইভি ছড়ায় না।
- সাধারণ মেলামেশা, করমর্দন, কোলাকুলি, আক্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে গল্প করা বা চলাফেরার মাধ্যমে এইচআইভি ছড়ায় না।
- কীট-পতঙ্গ, মশা-মাছির কামড়ে এইচআইভি ছড়ায় না।
- একই বাড়িতে বসবাস, একই বিছানায় ঘুমালে বা একই পায়খানা ব্যবহারে এইচআইভি ছড়ায় না।
- জামা কাপড়, তোয়ালে/গামছা বা বিছানার চাদর ব্যবহারে এইচআইভি ছড়ায় না।
- একই থালা বাসন ব্যবহার, একই গ্লাসে পানি বা একই কাপে চা পান করলে এইচআইভি ছড়ায় না।

এইচআইভি সংক্রমণ প্রতিরোধের উপায়

- **নিরাপদ আচরণ**
  - একাধিক যৌন সম্পর্ক এড়িয়ে চলা
  - যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা (এইচআইভি সংক্রমণের শতকরা ৮০-৯০ ভাগই ঘটে যৌনক্রিয়ার মাধ্যমে);
  - বাণিজ্যিক যৌন সম্পর্ক বর্জন করা
  - বিবাহপূর্ব বা বিবাহবহির্ভূত যৌন সম্পর্ক থেকে বিরত থাকা

চিত্র: বুকের দুধ খাওয়ানোর সময় শিশুর দেহে সংক্রমিত হতে পারে

  - ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ পরিবর্তন করে নিরাপদ যৌন অভ্যাস গড়ে তোলা
  - প্রতিবার যৌনমিলনের সময় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সঠিকভাবে কনডম ব্যবহার করা। কনডম এইচআইভি এবং অন্যান্য যৌনবাহিত রোগ সংক্রমণের ঝুঁকি হ্রাস করে।

- **নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালন ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার**
  - ইনজেকশন নেওয়া বা দেওয়ার সময় ইনজেকশনের সুঁচ ও সিরিঞ্জ পরিশোধিত করে নেওয়া; সম্ভব হলে একবার মাত্র ব্যবহার্য (Disposable) সিরিঞ্জ ব্যবহার করা;
  - ডাক্তারি বা যেকোনো প্রয়োজনে অন্যের ব্যবহৃত সুঁচ ও সিরিঞ্জ ব্যবহার না করা;
  - অপারেশনসহ সকল কাজে নিরাপদ ধারাল যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা;
  - রক্তের প্রয়োজন হলে পরীক্ষিত নিরাপদ রক্ত ব্যবহার করা। পরিসঞ্চালনের পূর্বে রক্তে এইচআইভি নেই তা নিশ্চিত হওয়া;
  - পেশাগত রক্তদাতাদের উপর নির্ভর না করে পরিচিতদের মধ্য থেকে স্বেচ্ছায় রক্তদান করা।

- **নিরাপদ মাতৃত্ব**
  - এইচআইভি সংক্রমিত মায়ের গর্ভের সন্তানও এইচআইভি সংক্রমিত হতে পারে। ঝুঁকিপূর্ণ আচরণের ইতিহাস থাকলে নারীদের গর্ভধারণের আগে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া;
  - এইচআইভি সংক্রমিত মায়ের সন্তানকে মায়ের দুধ পান করানোর ক্ষেত্রে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া।

- **যৌনবাহিত রোগের চিকিৎসা**
  - অন্যান্য যৌনবাহিত রোগ যেমন- গণোরিয়া, সিফিলিস, ট্রাইকোমোনিয়াসিস, ক্ল্যামাইডিয়া ইত্যাদি থাকলে অবহেলা না করে দ্রুত যথাযথ চিকিৎসা গ্রহণ করা। যৌনবাহিত রোগ এইচআইভি সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ায়।

- **ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতা মেনে চলা**
  - ধর্ম মানুষের মধ্যে মূল্যবোধ, সততা, শৃঙ্খলা ও ন্যায়-অন্যায় শিক্ষা দেয়। ধর্মের রীতিনীতি অনুসরণ করে সুশৃঙ্খল জীবন যাপনের মাধ্যমে সংক্রমণ এড়িয়ে সুস্থ থাকা যায়।

স্তন ও জরায়ুমুখের ক্যান্সার

স্তন ক্যান্সার

বিশ্বে নারী মৃত্যুর উল্লেখযোগ্য কারণ হলো স্তন ক্যান্সার। আমাদের দেশেও ক্যান্সারে যত নারীর মৃত্যু হয়, তার প্রধান কারণ স্তন ক্যান্সার। স্তন ক্যান্সার শুধু যে নারীরই হয় তা নয়, পুরুষরাও স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত হন। তবে নারীরা এতে বেশি আক্রান্ত হয়। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে বছরে গড়ে ১২,৭৬৪ জন নারী ক্যান্সারে আক্রান্ত হন এবং ৬,৮৪৪ মারা যান। (সূত্রঃ WHO Globocan 2018)

স্তন ক্যান্সার-এর পরিবর্তনযোগ্য কারণসমূহ

১) অনেক বেশি বয়স পর্যন্ত বিয়ে না করা এবং ৩০ বছর বয়সের পর নারীদের প্রথম সন্তানের মা হওয়া কিংবা সন্তান না নেওয়া নারীদের স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি অনেকাংশে বেড়ে যায়।

২) সন্তানকে নিয়মিত বুকের দুধ না খাওয়ানোর অভ্যাসের কারণে স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত হতে পারে।

৩) যারা অতিরিক্ত ফ্যাটযুক্ত খাবার খান এবং খাদ্যতালিকায় একেবারেই শাক-সবজি রাখেন না তাদের ক্ষেত্রে স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি অনেক বেশি। এছাড়াও দীর্ঘসময় প্রক্রিয়াজাত খাবার খাওয়া, প্রিজারভড (টিন/কৌটায় রক্ষিত) খাবার, কৃত্রিম মিষ্টি ও রঙযুক্ত খাবার খাওয়া নারী ও পুরুষের স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার জন্য দায়ী।

৪) অতিরিক্ত ওজন বেড়ে যাওয়া এবং শারীরিক পরিশ্রম একেবারেই না করা স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ায়।

৫) দীর্ঘদিন এয়ার ফ্রেশনার, কীটনাশক, অতিরিক্ত কেমিক্যালযুক্ত কসমেটিকস, ডিওডোরেন্ট এবং তেজস্ক্রিয় পদার্থের সংস্পর্শে থাকলে স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে।

৬) ভুল সাইজের ব্রা ব্যবহার করা। স্তনের আকার অনুযায়ী সঠিক মাপের ব্রা ব্যবহার করুন। তা না হলো এটি আপনার স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকিকে বাড়িয়ে দিতে পারে অনেকখানি। স্তনের আকারের চেয়ে বড় মাপের ব্রা স্তনের টিস্যুগুলোকে ঠিকমত সাপোর্ট দিতে পারে না, আবার অতিরিক্ত ছোট বা টাইট ব্রা স্তনের তরলবাহী লসিকাগুলো কেটে ফেলতে পারে।

৭) সারাক্ষণ ব্রা পরে থাকার কারণে ঘাম নির্গত হওয়ার অসুবিধা হয়, আর্দ্রতা জমে থাকে, সব মিলে স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ে। ঘরে থাকার সময়টুকু এবং রাতে ঘুমানোর সময় ব্রা ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকুন।

৮) লেবেল না দেখে ডিওডোরেন্ট কেনা। আজকাল কর্মজীবী নারী বা শিক্ষার্থী, সারাদিন বাইরে থাকেন আর প্রায় সবাই ঘামের দুর্গন্ধ এড়াতে ডিওডোরেন্ট ব্যবহার করেন। কিন্তু এই ডিওডোরেন্ট কেনার সময় লক্ষ্য রাখুন এতে কী কী উপাদান আছে। অ্যালুমিনিয়াম বেইজড উপাদান থাকলে তা স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ায়। ডিওডোরেন্ট যেহেতু আপনি প্রতিদিন ব্যবহার করেন, তাই কোন কোম্পানির পণ্যটি ব্যবহার করবেন তা আগে একজন স্কিন বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে জেনে নিন।

স্তন ক্যান্সার-এর অপরিবর্তনযোগ্য কারণসমূহ

৯) জেনেটিক কিছু কারণে মানুষ স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়। বিআরসিএ১, বিআরসিএ২ নামের জিনের মিউটেশন ৫% থেকে ১০% স্তন ক্যান্সারের জন্য দায়ী থাকে।

১০) বংশগত কারণে অনেকেই স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত হতে পারেন। যেমন- মা, খালা, বোন বা মেয়ে স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে থাকলে অনেকাংশে স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি বেড়ে যায়।

১১) মহিলাদের মাসিক শুরু এবং বন্ধের বয়সের পরেও এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি থাকে। যাদের ১২ বছর বয়সের পূর্বে মাসিক শুরু এবং ৫০ বছর বয়সের পর মাসিক বন্ধ হয় তাদের এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি থাকে।

১২) অ্যাস্ট্রোজেন হরমোনের প্রভাবে এই রোগে আক্রান্ত হতে দেখা যায়। যারা দীর্ঘ সময় ধরে অতিরিক্ত অ্যাস্ট্রোজেন হরমোনের সংস্পর্শে থাকেন, মাসিক বন্ধ হওয়ার পর মহিলাদের মধ্যে যারা হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি গ্রহণ করেন, তাদের স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

১৩) লিঙ্গভেদে ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে। একজন নারী পুরুষের তুলনায় অনেক বেশি স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকিতে থাকেন।

১৪) বয়স বাড়ার সাথে স্তন ক্যান্সারে আক্রান্তের সম্ভাবনা বাড়ে বিশেষ করে ৫০ বছর বয়সের পর এই ঝুঁকি অনেক বেশি বেড়ে যায়, যা মোটেও পরিবর্তনযোগ্য নয়।

স্তন ক্যান্সার বিষয়টি এতই গুরুত্বপূর্ণ আর এতই ব্যাপক যে এ সম্পর্কে একবারে সব আলোচনা সম্ভব নয়। স্তন ক্যান্সার সম্পর্কে জরুরি আরো কিছু তথ্য, রোগ নির্ণয় পদ্ধতি ও চিকিৎসা সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানা প্রয়োজন।

প্রধান লক্ষণ বা উপসর্গসমূহ

- স্তনের ভেতরে পিণ্ড অথবা স্তন পুরু হয়ে যাওয়া
- স্তনের বোঁটা থেকে রক্ত নিঃসরিত হওয়া
- স্তনের আকার বা আকৃতির পরিবর্তন হওয়া
- স্তনের উপরের ত্বকের পরিবর্তন হওয়া (যেমন: গর্ত হয়ে যাওয়া)
- স্তনের বোঁটা ভেতরে ঢুকে যাওয়া
- স্তনের বোঁটার চামড়া কুচকে যাওয়া অথবা চামড়া উঠে যাওয়া
- স্তনের চামড়া লাল হয়ে যাওয়া

উপরোক্ত যেকোনো ধরনের লক্ষণ বা উপসর্গ দেখা দিলে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে। পরবর্তীতে চিকিৎসক প্রয়োজনীয়

পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে নির্ণয় করতে পারবেন এটি স্তন ক্যান্সার কি না। প্রাথমিক পর্যায়ে ধরা পড়লে রোগীর সুস্থ হবার সম্ভাবনা অনেক বেশি, তাই নিয়মিত স্তন পরীক্ষা করে দেখতে হবে অস্বাভাবিক কোনো পরিবর্তন চোখে পড়ে কি না।

স্তন ক্যান্সার প্রতিরোধে প্রয়োজন সকলের সচেতনতা

১. শরীরের ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। বিশেষত, স্থূলতার সাথে স্তন ক্যান্সারের একটি যোগসূত্র রয়েছে।

২. প্রত্যেক নারীরই প্রতিদিন আধঘণ্টা ব্যায়াম অথবা যেকোনো ধরনের শারীরিক পরিশ্রম করা উচিত। কেননা এটা নারীদের স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি থেকে অনেকাংশে মুক্ত রাখে।

৩. স্বাস্থ্যসম্মত খাবার খেতে হবে। সবজি জাতীয় খাবার যেমন, বাঁধাকপি, ফুলকপি, ফলমূল ইত্যাদি বেশি খেতে হবে। এ ধরনের সবজি খাওয়ার অভ্যাস করলে স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি এড়ানো যায়।

৪. অতিরিক্ত মদ্যপান বা মদ্যপান থেকে বিরত থাকতে হবে।

স্তন ক্যান্সার কোনো লজ্জার বিষয় নয় বা কোনো গোপন রোগ নয়। এই বিষয়ে লজ্জার বা গোপন রোগ ভাববার আর কোনো সুযোগ নেই। আমাদের সকলের সচেতনতা ও সঠিক উদ্যোগ স্তন ক্যান্সার প্রতিরোধ করতে পারে।

জরায়ুমুখের ক্যান্সার

বিশ্বে নারীদের যত ধরনের ক্যান্সার বিদ্যমান তার মধ্যে জরায়ুমুখের ক্যান্সার উল্লেখযোগ্য। স্বল্পসংখ্যক প্রতিরোধযোগ্য ক্যান্সারের মধ্যে জরায়ুমুখ ক্যান্সার উল্লেখযোগ্য এবং এই ক্যান্সার প্রাথমিক পর্যায়ে সনাক্ত করা গেলে প্রতিরোধ করা যায়। বাংলাদেশে জরায়ুমুখের ক্যান্সার অধিক হওয়ার মূল কারণগুলোর একটি হলো কার্যকর পরীক্ষণ কর্মসূচির অভাব। কার্যকর পরীক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে উন্নত দেশগুলো প্রায় সম্পূর্ণভাবে জরায়ুমুখের ক্যান্সার থেকে মুক্ত হয়েছে অথচ আমাদের দেশে শতকরা ৮০ জন নারী জরায়ুমুখ ক্যান্সারের একবারে শেষ পর্যায়ে চিকিৎসার জন্য আসেন।

জরায়ুমুখের ক্যান্সার-এর কারণসমূহ

বহুবিধ গবেষণার সাহায্যে জরায়ুমুখের প্রাক-ক্যান্সার ও ক্যান্সারের জন্য দায়ী কিছু কারণ নির্ণয় করা গেছে। যেমন:

১. কিছু বিশেষ ধরনের হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাসের দ্বারা ৮০% সংক্রমণ হয়। এ ভাইরাসের মধ্যে শুধুমাত্র দ্বারা ৫০% সংক্রমণ হয়।

২. অপরিণত বয়সে যৌনমিলন (১৮ বছরের নিচে)

৩. বহু যৌনসঙ্গী

৪. অনুন্নত সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা

৫. ক্ল্যামাইডিয়া ট্র্যাকোম্যাটিস সংক্রমণ

৬. অধিক সন্তান জন্মদান

জরায়ুমুখের স্বাভাবিক গঠন

জরায়ু তার নিচের যে অংশ দ্বারা যোনিপথের সঙ্গে সংযোজিত হয় তাকে জরায়ুমুখ বা সার্ভিক্স বলে। এটির আকার ও আকৃতি স্ত্রীলোকের বয়স, প্রসবপরবর্তী পরিবর্তন এবং শরীরে হরমোনের পরিমাপের উপর নির্ভরশীল। স্পেকুলাম দ্বারা যোনিপথ উন্মুক্ত করলে এই বহিঃস্থ জরায়ুমুখ দেখা যায়। বহিস্থ ছিদ্রের উপর জরায়ুমুখের বাকি অংশকে বলা হয় অন্তঃস্থ জরায়ুমুখ।

প্রাথমিকভাবে সনাক্ত করা যায় ভায়া পরীক্ষার পদ্ধতি

- জরায়ুমুখ দৃষ্টিগোচরে আসার পর, কোনো নিঃসরণ থাকলে তা পরিষ্কার করা হয় এবং জরায়ুমুখ ভালোভাবে ৫% এসিটিক এসিড লাগানো হয়।
- কমপক্ষে ১ মিনিট পর, সম্পূর্ণ Squamocolumner junction (SCJ) সহ জরায়ুমুখ পরীক্ষা করা হয় কোনো acetowhite পরিবর্তন দেখার জন্য। ভায়া টেস্ট পজেটিভ হলে সাথে সাথে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ডাক্তার দিয়ে নিম্নবর্ণিত চিকিৎসা দেওয়া যেতে পারে। যেমন- cryotherapy/crycautry/cool coagulation/Co2 lasser therapy.

অধ্যায়-৯

পরিবার পরিকল্পনা সেবার তথ্য সংরক্ষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন

পরিবার পরিকল্পনা সেবার তথ্য সংরক্ষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন

পরিবার পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা

পরিবার পরিকল্পনা সরকারের একটি বহুমাত্রিক কর্মসূচি। এর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো জনসংখ্যা সীমিত রাখা। জন্মনিয়ন্ত্রণ ও জন্মবিরতিকরণের মাধ্যমে মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যু কমিয়ে আনা। বর্তমান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির লক্ষ্যমাত্রা হলো, জুন ২০২২ সালের মধ্যে সক্ষম বিবাহিত নারী প্রতি গড় সন্তান সংখ্যা ২.০ এ নামিয়ে আনা, যার মাধ্যমে প্রতিস্থাপনযোগ্য জনউর্বরতা অর্জন করা সম্ভব হবে। এজন্য বিভিন্ন পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার ২০২২ সালের মধ্যে কমপক্ষে ৭৫%-এ উন্নীত করতে হবে। এতে স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদি পদ্ধতির অংশগ্রহণ হতে হবে ২০%। জুন ২০২২ সালের মধ্যে মাতৃমৃত্যুর হার প্রতিহাজার জীবিত জন্মে ১.৭৬ থেকে ১.২১ এ নামিয়ে আনা ও পরিবার পরিকল্পনার অপূরণীয় চাহিদা ১২% থেকে ১০% নামিয়ে আনা এবং পদ্ধতি ছেড়ে দেওয়ার হার ৩০% থেকে ২০% কমিয়ে আনা প্রয়োজন। তাই আমরা যদি কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে চাই তাহলে সেবাপ্রদানকারীর দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি সেবার গুণগত মানের উন্নয়নের লক্ষ্যে আরো কাজ করতে হবে। এজন্য প্রয়োজন সমন্বিত উদ্যোগ।

পরিবার পরিকল্পনার তথ্য ব্যবস্থাপনা (এমআইএস)

পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির সাফল্যের দলিল হলো তথ্য সংরক্ষণ। পরিবার পরিকল্পনার প্রতিটি অর্জন মাঠ পর্যায় থেকে কেন্দ্রীয় পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য রয়েছে আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর তথ্য ব্যবস্থাপনা। বর্তমান প্রযুক্তির যুগে তথ্যই শক্তি। তথ্য ব্যবস্থাপনা একটি শক্তিশালী ইউনিট। তথ্যের উপর নির্ভর করে পরবর্তী পরিকল্পনা, কৌশল নির্ধারণ ও নীতিগত সিদ্ধান্ত। উর্ধ্বতন নীতিমালা প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের তথ্য ও উপাত্ত সরবরাহ করা তথ্য ব্যবস্থাপনা (এমআইএস)-এর মূল কাজ।

তথ্য ও উপাত্ত সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

যেকোনো কর্মসূচির তথ্য সংরক্ষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেমন-

- তথ্য ও উপাত্ত হচ্ছে কর্মসূচির রেজাল্ট
- তথ্য ও উপাত্ত হচ্ছে কর্মসূচির প্রতিবেদন তৈরির জন্য আবশ্যকীয় উপকরণ
- তথ্য ও উপাত্ত হচ্ছে কর্মসূচির দলিল ও প্রমাণ
- তথ্য ও উপাত্ত কর্মসূচির অগ্রগতি মূল্যায়নের জন্য
- পরবর্তী পরিকল্পনা, কৌশল নির্ধারণ ও নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তথ্য ও উপাত্ত অত্যন্ত জরুরি।

তথ্য ও উপাত্ত সংরক্ষণের পদ্ধতি

পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির তৃণমূল পর্যায় থেকে তথ্য সংরক্ষণের জন্য ডিজিটাল পদ্ধতির ব্যবস্থা রয়েছে। পাশাপাশি অফলাইন পদ্ধতিও চালু রয়েছে যাতে কোনো তথ্য বাদ না পড়ে। গ্রাম ও শহর পর্যায়ে প্রতিটি সেবা কেন্দ্রে তথ্য রেজিস্টার ও এমআইএস ফরমেট সরবরাহ করা হয়। সেবাপ্রদানকারীগণ দৈনিকভিত্তিতে সেবার ও সেবাগ্রহণকারীর তথ্য লিপিবদ্ধ করে রাখেন এবং প্রতিমাসে মাসিক প্রতিবেদন উপজেলা পর্যায়ে পাঠান। উপজেলা কর্তৃপক্ষ তথ্য যাচাই বাছাই করে জেলা পর্যায়ে পাঠান। জেলা কর্তৃপক্ষ অধীনস্ত উপজেলাগুলোর তথ্য যাচাই বাছাই ও সংকলিত করে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে এমআইএস ইউনিটে পাঠান।

তথ্যের ব্যবহার

পরিবার পরিকল্পনার তথ্য ও উপাত্তের ব্যবহার বহুবিধ। তথ্য ও উপাত্ত শুধু পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর নয়, বরং সরকারের বিভিন্ন অধিদপ্তর, মন্ত্রণালয়, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও দাতাসংস্থা ব্যবহার করে থাকেন। যেমন-

- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
- স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
- নিপোর্ট
- বিশ্ব ব্যাংক
- আইএমএফ
- ইউএনএফপিএ
- ইউএনডিপি
- ডব্লিউএইচও
- ইউনিসেফ
- ইউএসএআইডি
- বিভিন্ন দাতাসংস্থা
    - পরিবার পরিকলপনা কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী এনজিও
    - অন্যান্য সরকারি/বেসরকারি গবেষণা ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান

গবেষণা, প্রতিবেদন প্রণয়ন, অগ্রগতি পর্যালোচনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, বাজেট বরাদ্ধ ও তহবিল সংগ্রহসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তথ্য ও উপাত্ত ব্যবহার করা হয়।

সেবাকেন্দ্রের তথ্য রেজিস্টার

- সেবাপ্রদানকারী প্রত্যেক সেবাগ্রহণকারীর গৃহিত প্রতিটি সেবার তথ্য বিবরণী লিপিবদ্ধ করবেন।
- প্রতিটি লাইন একজন সেবাগ্রহণকারীর জন্য ব্যবহার করবেন।
- একবার রেজিস্ট্রেশনের পর উক্ত সেবাগ্রহণকারী যতবার পরিবার পরিকল্পনা সেবা নিবেন ততবার ঐ লাইনে লিপিবদ্ধ করবেন।
- প্রতিলাইনে ৮বার সেবা নেওয়ার তথ্য লিপিবদ্ধ করা যাবে।
- সেবাপ্রদানকারীগণ প্রতিলাইনে কীভাবে তথ্য লিপিবদ্ধ করবেন তা রেজিস্টারে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

এমআইএস ফর্ম ও মাসিক প্রতিবেদন

- সেবাকেন্দ্র থেকে প্রদত্ত পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য, কিশোর-কিশোরী স্বাস্থ্য, কাউন্সেলিংসহ প্রতিটি সেবার তথ্য এমআইএস ফর্ম-৩ তথা মাসিক প্রতিবেদন ফরমেটে মাস শেষে লিপিবদ্ধ করবেন
- মাসিক মজুদ ও বিতরণের হিসাবও ফরমেটে নির্ধারিত কলামে লিপিবদ্ধ করবেন
- তথ্য ও উপাত্ত যাচাই বাছাই করে উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে পাঠাবেন।

তথ্য রেজিস্টার ও এমআইএস ফর্ম/মাসিক প্রতিবেদন পূরণের ব্যবহারিক চর্চা

- প্রশিক্ষক/সহায়ক নমুনা তথ্য রেজিস্টার ও এমআইএস ফর্ম/ মাসিক প্রতিবেদন অংশগ্রহণকারীদের বিতরণ করবেন।
- তথ্য রেজিস্টার ও এমআইএস ফর্ম/মাসিক প্রতিবেদন পূরণের বিষয় হাতে-কলমে দেখিয়ে দিবেন।
- অংশগ্রহণকারীদের ছোট দলে ভাগ করে দলীয়ভাবে এমআইএস ফর্ম/মাসিক প্রতিবেদন পূরণ করতে দিবেন।

পোশাক শিল্পে কর্মরত সেবাপ্রদানকারীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য, অধিকার এবং পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

সংযুক্তি: ১

প্রশিক্ষণ সূচি

দিন/সময়	বিষয়বস্তু	রিসোর্স পারসন/প্রশিক্ষক
প্রথম দিন:		
০৯:০০-০৯:৩০	রেজিস্ট্রেশন ও প্রশিক্ষণ-পূর্বজ্ঞান যাচাই	
০৯:৩০-১০:৩০	উদ্বোধনী অধিবেশন, কোর্সের পটভূমি এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, প্রশিক্ষণ নীতিমালা, প্রত্যাশা নিরূপণ, জড়তা কাটানো	
১০:৩০-১১:৩০	যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য, অধিকার এবং জেন্ডার সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা	
১১:৩০-১১:৪৫ চা বিরতি		
১১:৪৫-১২:৪৫	আচরণ পরিবর্তন যোগাযোগ ও কাউন্সেলিং	
১২:৪৫-০১:১৫	মাসিক (ঋতুচক্র) স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা	

দিন/সময়	বিষয়বস্তু	রিসোর্স পারসন/প্রশিক্ষক
০১:১৫-০২:০০ মধ্যাহ্ন বিরতি		
০২:০০-০২:৪৫	কৈশোরে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং বাল্যবিবাহ	
০২:৪৫-০৩:০০ চা বিরতি		
০৩:০০-০৪:০০	নিরাপদ মাতৃত্ব ও জরুরি প্রসূতি সেবা এবং নবজাতকের অত্যাবশ্যকীয় সেবা	
০৪:০০-০৪:৪৫	যৌন ও জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা এবং নারী ও শিশু নির্যাতন	
০৪:৪৫-০৫:০০	প্রথমদিনের সমাপ্তি ও দ্বিতীয়দিনের ঘোষণা	

দ্বিতীয় দিন:

০৯:০০-০৯:১৫	পূর্বদিনের আলোচনা	
০৯:১৫-১১:১৫	পরিবার পরিকল্পনা, মাসিক নিয়মিতকরণ, জরুরি গর্ভ নিরোধক ও গর্ভপাত পরবর্তী সেবা	
১১:১৫-১১:৩০ চা বিরতি		

দিন/সময়	বিষয়বস্তু	রিসোর্স পারসন/প্রশিক্ষক
১১:৩০-১২:৩০	প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ, যৌনবাহিত সংক্রমণ এবং এইচআইভি ও এইডস; জরায়ুমুখের ক্যান্সার ও স্তন ক্যান্সার	
১২:৩০-০১:১৫	পরিবার পরিকল্পনা সেবার তথ্য সংরক্ষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন	
০১:১৫-০২:০০ মধ্যাহ্ন বিরতি		
০২:০০-০৩:০০	ব্যবহারিক (১ম অংশ)	
০৩:০০-০৩:১৫ চা বিরতি		
০৩:১৫-০৪:২০	ব্যবহারিক (২য় অংশ)	
০৪:২০-০৫:০০	প্রশিক্ষণ পরবর্তী জ্ঞান যাচাই, কোর্স মূল্যায়ন ও সমাপনী অধিবেশন	

সংযুক্তি: ২

কাউন্সেলিং-এর অনুশীলন চেকলিস্ট

ধাপ	বিবরণ	ভালো	দুর্বল	মন্তব্য
১ম ধাপ	**সম্ভাষণ জানানো**			
	১. কাউন্সেলর, গ্রহীতাকে আন্তরিকভাবে সম্ভাষণ জানিয়েছেন			
	২. কাউন্সেলর, গ্রহীতাকে সহজ হবার/করার জন্য সাহায্য করেছেন।			
২য় ধাপ	**প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে যাচাই করা**			
	১. বিষয় সম্পর্কে গ্রহীতার জ্ঞান যাচাই করেছেন			
	২. গ্রহীতাকে প্রশ্ন করে তার প্রয়োজন যাচাই করেছেন			
	৩. কথা বলা ও শোনার সময় যথাযথ অঙ্গভঙ্গি করেছেন			
	৪. গ্রহীতার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন			
	৫. গ্রহীতার সন্তান জন্মের ও শারীরিক অসুস্থতার ইতিহাস নিয়েছেন			
	৬. সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন।			
৩য় ধাপ	**বিষয়বস্তু সম্পর্কে বলা**			
	১. গ্রহীতার প্রয়োজন অনুযায়ী আলোচনা করেছেন			
	২. আলোচনা করার বা বলার সময় উপকরণ ব্যবহার করেছেন			

ধাপ	বিবরণ	ভালো	দুর্বল	মন্তব্য
	৩. এমনভাবে কথা বলেছেন যেন গ্রহীতা বুঝতে পারেন			
	৪. গ্রহীতাকে সঠিকভাবে তথ্য দিয়েছেন			
	৫. গ্রহীতার কোনো কুসংস্কার বা ভুল ধারণা থাকলে তার প্রতি সম্মান রেখে কৌশলে শুধরে দিয়েছেন			
	৬. বলার ভঙ্গি সহজ সাবলীল। প্রয়োজনে উদাহরণ ব্যবহার করেছেন।			
৪র্থ ধাপ	**সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করা**			
	১. গ্রহীতাকে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করেছেন			
	২. গ্রহীতা স্বেচ্ছায় অবহিত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।			
৫ম ধাপ	**বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখা প্রদান**			
	১. সিদ্ধান্ত নেবার পর গ্রহীতাকে প্রয়োজনীয় সব তথ্য দেয়া হয়েছে			
	২. এমনভাবে তথ্য দিয়েছেন যেন গ্রহীতা সঠিকভাবে বুঝতে পারেন			
	৩. প্রয়োজনীয় নির্দেশসমূহ সহজ ও পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন			
	৪. কোনো সমস্যা হলে কোথায় যেতে হবে তা বলে দিয়েছেন।			
৬ষ্ঠ ধাপ	**পুনরালোচনা/ফলোআপ/রেফারেন্স**			
	১. আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো পুনরালোচনা করেছেন			
	২. গ্রহীতা বিষয়টি বুঝেছে কি না তার ফিডব্যাক নিয়েছেন			
	৩. পরবর্তী ফলোআপের গুরুত্ব ও তারিখ জানিয়েছেন			
	৪. কোন ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ফলোআপের তারিখের আগেই যোগাযোগ করতে হবে তা বলেছেন			
	৫. প্রয়োজনে রেফার করেছেন।			

সংযুক্তি: ৩

কাউন্সেলিং-এর অনুশীলন চেকলিস্ট

মিশ্র খাবার বড়ি "সুখী" গ্রহীতা বাছাইকরণ চেকলিস্ট
শুধুমাত্র প্রজেস্টেরন সমৃদ্ধ খাবার বড়ি "আপন" গ্রহীতা বাছাইকরণ চেকলিস্ট
গর্ভনিরোধক ইনজেকটেবলস "স্বস্তি" গ্রহীতা বাছাইকরণ চেকলিস্ট
ইমপ্ল্যান্ট গ্রহীতা বাছাইকরণ চেকলিস্ট
আই ইউ ডি গ্রহীতা বাছাইকরণ চেকলিস্ট
১ রড
২ রড

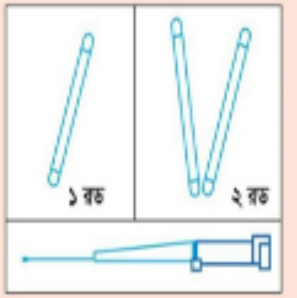

সংযুক্তি: ৪

বিভাগীয় পর্যায়ে অবস্থিত ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেলের যোগাযোগের নম্বর:

নারী ও শিশু নির্যাতন দম আইন ২০০০-এর আওতায় আইনী সহায়তা প্রদানের জন্য নারী ও কন্যা শিশুদের জন্য সরকার বিভাগীয় পর্যায়ে নিরাপদ আবাসন বা আশ্রয় কেন্দ্র স্থাপন করেছেন। বিচারাধীন মামলার নারী ও কন্যা শিশুদের আইনী সহায়তা ও নিরাপত্তার জন্য কারাগারের পরিবর্তে নিরাপদ আবাসন বা আশ্রয় কেন্দ্রে রাখা হয়।

সেবাকেন্দ্র

ক্রমিক	ঠিকানা	ফোন	মোবাইল নম্বর
১	টেপাখোলা, ফরিদপুর	+৮৮০৬৩১৬৪৪২০	+৮৮০১৭১১২৪৮০৮৫
২	বাগবাড়ী, সিলেট	+৮৮০৮২১৭১৩৫১২	+৮৮০১৭১৬১২৮৩৭০
৩	সাগরদি, বরিশাল	+৮৮০৪৩১৭১১২৯	+৮৮০১৭১৫৬৩৫৮৬৬
৪	বায়া, রাজশাহী	+৮৮০৭২১৮০০১৮৯	+৮৮০১৭১৮৬২০৩১০
৫	ফরহাদাবাদ, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম	+৮৮০৩১২৫৫০১১৭	+৮৮০১৮১৯৯৪১১০৬
৬	বাগেরহাট সদর, বাগেরহাট	+৮৮০৪৬৮৬২৮৫৫	+৮৮০১৯১১১০০১৭৭

অনুমোদিত নিরাপদ আশ্রয় কেন্দ্র/আবাসন

ক্রমিক	ঠিকানা	ঠিকানা	স্থাপিত	প্রতিষ্ঠানের ধরন	সিট সংখ্যা
১	টেপাখোলা, ফরিদপুর সদর, ফরিদপুর	টেপাখোলা, ফরিদপুর সদর, ফরিদপুর	১৯৯৯	নারী ও কন্যাশিশু	৫০
২	বাগবাড়ী, সিলেট	বাগবাড়ী, সিলেট	২০০২	নারী ও কন্যাশিশু	৫০
৩	সাগরদি, বরিশাল	সাগরদি, বরিশাল	২০০২	নারী ও কন্যাশিশু	৫০
৪	বায়া, রাজশাহী	বায়া, রাজশাহী	২০০৩	নারী ও কন্যাশিশু	৫০
৫	ফরহাদাবাদ, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম	ফরহাদাবাদ, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম	২০০৩	নারী ও কন্যাশিশু	৫০
৬	বাগেরহাট সদর, বাগেরহাট	বাগেরহাট সদর, বাগেরহাট	২০০৩	নারী ও কন্যাশিশু	৫০
				মোট	৩০০

Source: http://www.judiciary.org.bd/en/one-stop-crisis-centre

সংযুক্তি: ৫

জেলা ও উপজেলা সদর হাসপাতালে অবস্থিত ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেলে যোগাযোগের নম্বর

জেলা সদর হাসপাতালে অবস্থিত ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেলের মোবাইল নম্বর:		
ক্রমিক	ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেল	মোবাইল নম্বর
১.	মুন্সিগঞ্জ জেলা সদর হাসপাতাল	০১৭৩০৭৮১০০০
২.	নরসিংদী জেলা সদর হাসপাতাল	০১৭৩০৭৮১০০১
৩.	গাজীপুর জেলা সদর হাসপাতাল	০১৭৩০৭৮১০০২
৪.	কিশোরগঞ্জ জেলা সদর হাসপাতাল	০১৭৩০৭৮১০০৩
৫.	নেত্রকোনা জেলা সদর হাসপাতাল	০১৭৩০৭৮১০০৪
৬.	টাঙ্গাইল জেলা সদর হাসপাতাল	০১৭৩০৭৮১০০৫
৭.	শেরপুর জেলা সদর হাসপাতাল	০১৭৩০৭৮১০০৬
৮.	মাদারীপুর জেলা সদর হাসপাতাল	০১৭৩০৭৮১০০৭
৯.	শরীয়তপুর জেলা সদর হাসপাতাল	০১৭৩০৭৮১০০৮
১০.	নারায়ণগঞ্জ জেলা সদর হাসপাতাল	০১৭৩০৭৮১০০৯
১১.	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা সদর হাসপাতাল	০১৭৩০৭৮১০১০
১২.	নওগাঁ জেলা সদর হাসপাতাল	০১৭৩০৭৮১০১১
১৩.	বগুড়া জেলা সদর হাসপাতাল	০১৭৩০৭৮১০১২
১৪.	নাটোর জেলা সদর হাসপাতাল	০১৭৩০৭৮১০১৩
১৫.	পাবনা জেলা সদর হাসপাতাল	০১৭৩০৭৮১০১৪
১৬.	সিরাজগঞ্জ জেলা সদর হাসপাতাল	০১৭৩০৭৮১০১৫
১৭.	পঞ্চগড় জেলা সদর হাসপাতাল	০১৭৩০৭৮১০১৬
১৮.	লালমনিরহাট জেলা সদর হাসপাতাল	০১৭৩০৭৮১০১৭
১৯.	দিনাজপুর জেলা সদর হাসপাতাল	০১৭৩০৭৮১০১৮

জেলা সদর হাসপাতালে অবস্থিত ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেলের মোবাইল নম্বর:		
২০.	কুষ্টিয়া জেলা সদর হাসপাতাল	০১৭৩০৭৮১০১৯
২১.	মেহেরপুর জেলা সদর হাসপাতাল	০১৭৩০৭৮১০২০
২২.	চুয়াডাঙ্গা জেলা সদর হাসপাতাল	০১৭৩০৭৮১০২১
২৩.	ঝিনাইদহ জেলা সদর হাসপাতাল	০১৭৩০৭৮১০২২
২৪.	মাগুরা জেলা সদর হাসপাতাল	০১৭৩০৭৮১০২৩
২৫.	যশোর জেলা সদর হাসপাতাল	০১৭৩০৭৮১০২৪
২৬.	সাতক্ষীরা জেলা সদর হাসপাতাল	০১৭৩০৭৮১০২৫
২৭.	বাগেরহাট জেলা সদর হাসপাতাল	০১৭৩০৭৮১০২৬
২৮.	সুনামগঞ্জ জেলা সদর হাসপাতাল	০১৭৩০৭৮১০২৭
২৯.	হবিগঞ্জ জেলা সদর হাসপাতাল	০১৭৩০৭৮১০২৮
৩০.	ঝালকাঠি জেলা সদর হাসপাতাল	০১৭৩০৭৮১০২৯
৩১.	পিরোজপুর জেলা সদর হাসপাতাল	০১৭৩০৭৮১০৩০
৩২.	পটুয়াখালী জেলা সদর হাসপাতাল	০১৭৩০৭৮১০৩১
৩৩.	বরগুনা জেলা সদর হাসপাতাল	০১৭৩০৭৮১০৩২
৩৪.	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সদর হাসপাতাল	০১৭৩০৭৮১০৩৩
৩৫.	চাঁদপুর জেলা সদর হাসপাতাল	০১৭৩০৭৮১০৩৪
৩৬.	লক্ষ্মীপুর জেলা সদর হাসপাতাল	০১৭৩০৭৮১০৩৫
৩৭.	ফেনী জেলা সদর হাসপাতাল	০১৭৩০৭৮১০৩৬
৩৮.	খাগড়াছড়ি জেলা সদর হাসপাতাল	০১৭৩০৭৮১০৩৭
৩৯.	বান্দরবান জেলা সদর হাসপাতাল	০১৭৩০৭৮১০৩৮
৪০.	কক্সবাজার জেলা সদর হাসপাতাল	০১৭৩০৭৮১০৩৯
৪১.	জামালপুর জেলা সদর হাসপাতাল	০১৭১৩৫৬৯৫৫০
৪২.	ঠাকুরগাঁও জেলা সদর হাসপাতাল	০১৭১৩৫৬৯৫৫১
৪৩.	মানিকগঞ্জ জেলা সদর হাসপাতাল	০১৭১৩৫৬৯৫৫২
৪৪.	ভোলা জেলা সদর হাসপাতাল	০১৭১৩৫৬৯৫৫৩
৪৫.	নড়াইল জেলা সদর হাসপাতাল	০১৭১৩৫৬৯৫৫৪

জেলা সদর হাসপাতালে অবস্থিত ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেলের মোবাইল নম্বর:		
৪৬.	কুড়িগ্রাম জেলা সদর হাসপাতাল	০১৭১৩৫৬৯৫৫৫
৪৭.	নীলফামারী জেলা সদর হাসপাতাল	০১৭১৩৫৬৯৫৫৬
৪৮.	জয়পুরহাট জেলা সদর হাসপাতাল	০১৭১৩৫৬৯৫৫৭
৪৯.	রাজবাড়ী জেলা সদর হাসপাতাল	০১৭১৩৫৬৯৫৫৮
৫০.	গাইবান্ধা জেলা সদর হাসপাতাল	০১৭১৩৫৬৯৫৫৯
৫১.	মৌলভীবাজার জেলা সদর হাসপাতাল	০১৭১৩৫৬৯৫৬০
৫২.	রাঙ্গামাটি জেলা সদর হাসপাতাল	০১৭১৩৫৬৯৫৬১

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে অবস্থিত ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেলের মোবাইল নম্বর:		
ক্রমিক নং	ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেল	মোবাইল নম্বর
১.	ঝিনাইগাতি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	০১৭৩০৭৮১০৪০
২.	কুলিয়ারচর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	০১৭৩০৭৮১০৪১
৩.	পাংশা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	০১৭৩০৭৮১০৪২
৪.	টুঙ্গিবাড়ী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	০১৭৩০৭৮১০৪৩
৫.	টুঙ্গিপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	০১৭৩০৭৮১০৪৪
৬.	বরুড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	০১৭৩০৭৮১০৪৫
৭.	রামগতি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	০১৭৩০৭৮১০৪৬
৮.	লংগদু উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	০১৭৩০৭৮১০৪৭
৯.	টেকনাফ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	০১৭৩০৭৮১০৪৮
১০.	নন্দিগ্রাম উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	০১৭৩০৭৮১০৪৯
১১.	শিবগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	০১৭৩০৭৮১০৫০
১২.	তেঁতুলিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	০১৭৩০৭৮১০৫১
১৩.	পার্বতীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	০১৭৩০৭৮১০৫২
১৪.	চিলমারী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	০১৭৩০৭৮১০৫৩
১৫.	আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	০১৭৩০৭৮১০৫৪
১৬.	ঝিকরগাছা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	০১৭৩০৭৮১০৫৫

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে অবস্থিত ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেলের মোবাইল নম্বর:		
১৭.	শ্যামনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	০১৭৩০৭৮১০৫৬
১৮.	ছাতক উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	০১৭৩০৭৮১০৫৭
১৯.	কুলাউড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	০১৭৩০৭৮১০৫৮
২০.	কলাপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	০১৭৩০৭৮১০৫৯

****নারী ও শিশু নির্যাতন অথবা পাচারের ঘটনা ঘটলে বা ঘটার সম্ভাবনায় যেকোনো নম্বর থেকে ফোন করুন- ১০৯।**

****যেকোনো সহিংসতার ক্ষেত্রে জরুরি সেবা পেতে যোগাযোগ করুন: ৯৯৯ নম্বরে।**

****কল সেন্টার নম্বর পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর: ১৬৭৬৭।**

**** কল সেন্টার নম্বর স্বাস্থ্য অধিদপ্তর: ১৬২৬৩।**

সংযুক্তি: ৬

যৌন ও জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার ক্ষেত্রে সেবাপ্রদানকারী সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের তালিকা

ক্রমিক	প্রতিষ্ঠানের নাম	ধরন	সেবাপ্রদানের সময়	মন্তব্য
১.	ওসিসি	সরকারি-বেসরকারি সমন্বয়	২৪ ঘণ্টা	বিভাগীয় সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসহ ৫২ জেলা ও ২০ উপজেলা হাসপাতালে কার্যক্রম পরিচালিত হয়।
২.	নারী ও শিশু বিষয়ক অধিদপ্তর	সরকারি	সাপ্তাহিক ছুটির দিন বাদে সকাল ৯টা-বিকাল ৫টা পর্যন্ত।	বিভাগ, জেলা এবং উপজেলা পর্যায় কার্যক্রম পরিচালিত হয়। দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন কর্মকর্তা সকল পর্যায়ে আছেন।
৩.	ভিকটিম সার্পোট সেন্টার, তেজগাঁও, ঢাকা	সরকারি	২৪ ঘণ্টা	যেসকল কেস এর সাথে পুলিশ যুক্ত থাকে তাদের ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করা হয়।
৪.	বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবি সমিতি	বেসরকারি	শনি-বৃহস্পতি সকাল ৯টা-বিকাল ৫টা পর্যন্ত।	ঢাকা কেন্দ্রীয় কার্যালয়সহ প্রতিটি বিভাগে শাখা অফিস আছে। এছাড়াও প্রায় ৫৬ জেলা শহরে মেম্বার আইনবিদ আছেন।
৫.	বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ	বেসরকারি	রবি-বৃহস্পতি সকাল ৯টা-বিকাল ৫টা পর্যন্ত	ঢাকা কেন্দ্রীয় কার্যালয়সহ প্রতিটি বিভাগে শাখা অফিস আছে। প্রায় প্রতিটি জেলা শহরে প্রতিনিধি আছে।
৬.	আইন ও সালিশ কেন্দ্র	বেসরকারি	রবি-বৃহস্পতি সকাল ১০টা-বিকাল ৬টা পর্যন্ত	কেন্দ্রীয় কার্যালয় ঢাকা, প্রতিটি জেলার সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিবর্গ আছে।
৭.	নারীপক্ষ	বেসরকারি	রবি-বৃহস্পতি সকাল ১০টা-বিকাল ৬টা পর্যন্ত	কেন্দ্রীয় কার্যালয় ঢাকা, প্রতিটি জেলার সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিবর্গ আছে।
৮.	রংধনু চিহ্নিত নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্র	সরকারি-বেসরকারি সমন্বয় প্রকল্প	শনি-বৃহস্পতি সকাল ৯টা-বিকাল ৪টা পর্যন্ত।	২৫টি প্রকল্প কর্মক্ষেত্রে কাজ করে।
৯.	ব্লাস্ট	বেসরকারি	শনি-বৃহস্পতিসকাল ১০টা -বিকাল ৫টা পর্যন্ত।	ঢাকা কেন্দ্রীয় কার্যালয়। প্রতিটি জেলাতে প্রতিনিধি আছে।

তথ্য সূত্রঃ

১। *পরিবার পরিকল্পনা ম্যানুয়াল; পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর; ঢাকা; ২০১৮*

২। *মাঠকর্মীদের পরিবার পরিকল্পনা প্রশিক্ষণ; প্রশিক্ষণার্থী সহায়িকা; পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর; ঢাকা; মার্চ ২০১৮*

৩। *কমিউনিটিভিত্তিক পুষ্টিকর্মী সহায়িকা; ইউএসএআইডি; কারিতাস বাংলাদেশ; ঢাকা; ২০১৭*

৪। *যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ সহায়ক ম্যানুয়াল; জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ও প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ; ঢাকা; সেপ্টেম্বর ২০১৭*

৫। *কৈশোর বান্ধব স্বাস্থ্যসেবা পরিচালনা সহায়িকা; এমসিএইচ সার্ভিসেস ইউনিট; পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর; ঢাকা; ডিসেম্বর ২০১৫*

৬। *প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষা সহায়িকা (পিয়ার হ্যান্ডবুক) ইউবিআর বাংলাদেশ এ্যালায়েন্স; এফপিএবি ও অন্যান্য; ঢাকা; এপ্রিল ২০১৩*

৭। *এইডস সম্পর্কে জানুন, সুস্থ থাকুন; রেহান উদ্দিন আহমেদ রাজু, জাতীয় এইডস/এসটিডি প্রোগ্রাম, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর; ২০০৭*

৮। *প্রজনন স্বাস্থ্য সহায়িকা; স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়; ইউএনএফপিএ; ভিএইচএসএস; ঢাকা; মে ২০০২*

৯। *কিউআই ম্যানুয়াল; আরএসডিপি ফিল্ড ম্যানেজারদের জন্য; ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেটেড পপুলেশন এন্ড হেলথ প্রোগ্রাম; ঢাকা; ফেব্রুয়ারি ২০০১*

১০। *প্রজননতন্ত্র ও যৌনবাহিত সংক্রমণ ব্যবস্থাপনায় কারিগরি মান এবং সেবা প্রদানের নীতিমালা; স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়; ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেটেড পপুলেশন এন্ড হেলথ প্রোগ্রাম; ঢাকা; জুলাই ১৯৯৯*

১১। *যৌন রোগ ও এইচআইভি/এইডস কাউন্সেলিং; রেহান উদ্দিন আহমেদ রাজু; ভিএইচএসএস; ১৯৯৯*

১২। *কিশোর কিশোরীদের জন্য পারিবারিক জীবন শিক্ষা পাঠক্রম; ভিএইচএসএস; মার্চ ১৯৯৪*

১৩। *যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার বিষয়ক পিয়ার লিডার প্রশিক্ষণ সহায়িকা; হাসাব বাংলাদেশ*

১৪। *পুষ্টি বিষয়ক মৌলিক প্রশিক্ষণ (হ্যান্ডআউট); জাতীয় পুষ্টি সেবা; জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান; ঢাকা*

পোশাক শিল্পে কর্মরত সেবাপ্রদানকারীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য, অধিকার এবং পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণ সহায়িকা